পুরাণ ও ব্যাসদেব

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকের এমন কি আধুনিক অনেকানেক পণ্ডিতগণেরও সরল বিশ্বাস, যে অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ পরাশরপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত। এই বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। সমগ্র পুরাণ যে বেদব্যাসের রচনা নহে, তাহার কয়েকটি প্রমাণ আমরা নিম্নে দর্শাইতেছি।

প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। অধিক কি, তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রারম্ভেই অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বৎসর গত হইল রাজত্ব করেন। সুতরাং ব্যাসদেব পাঁচ হাজার বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১। যাঁহারা পুরাণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে অষ্টাদশ পুরাণই বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ও পুরাণে যেখানে বুদ্ধদেবের কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তথায় অতীত কালের ক্রিয়া ব্যতীত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার উল্লেখ নাই। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পূর্ব্বেবশ্যই উপপুরাণ সকল লিখিত হইয়াছে। শিব পুরাণের পূর্ব্বার্দ্ধে পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে বুদ্ধদেবের পরে পুরাণ শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে।

এখন অনেকে, বৌদ্ধ রাজাদিগের জয়স্তম্ভ, মন্দির, স্তূপাদি তথা আর্য্যাবর্ত্ত, লঙ্কাদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতীয় গ্রন্থাদির প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব বিক্রমাদিত্যের ছয় শত চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে গোরক্ষপুরের নিকট কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন ও অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পরলোকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রায় ২৬২৩ দুই হাজার ছয় শত তেইশ বৎসর গত হইল বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পাঁচ হাজার বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে ব্যাসদেবের জন্ম হয়। সুতরাং বুদ্ধদেব ব্যাসদেবের প্রায় দুই হাজার চারি শত কয়েক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই বুদ্ধদেবের সময় ব্যাসদেবের থাকা সম্ভব না।

কোন কোন পৌরাণিক মহাশয় বলিতে পারেন যে, পুরাণের মতে, ব্যাস অমর, অতএব তিনি যে বুদ্ধদেবের পরে পুরাণ প্রণয়ন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? নীরবতাই এ বাক্যের প্রকৃত প্রত্যুত্তর। তথাচ আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যাসদেব বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা ও পূর্ণ বেদজ্ঞ। তিনি যদি বুদ্ধদেবের সময় জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে দেশমধ্যে অবশ্যই বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার প্রতিরোধ করিতেন। কিন্তু কোন স্থানেই অর্থাৎ কি বৌদ্ধ গ্রন্থে বা পুরাণে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাসের কোন বিরোধী তর্ক দেখা যায় না। অতএব পুরাণ প্রচারের সময় ব্যাসদেব যে জীবিত ছিলেন ইহা অসম্ভব।

২। রামানুজ স্বামী, বিক্রম ১২০০ বারশত সম্বতে আর্য্য ভূমিতে আবির্ভূত হন, ইহা সকল ইতিহাসবেত্তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন রামানুজ স্বামীই প্রথমে বৈষ্ণবদিগের দেহ বিষ্ণুচক্রে অঙ্কিত করিবার প্রথা প্রচলিত করেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে লিঙ্গপুরাণ বলিয়াছেন

"শঙ্খচক্রে তাপয়িত্বা যশ্য দেহঃ প্রদহ্যতে।
নসজীব কুণপস্ত্যাজ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

যে মনুষ্যের শরীর অগ্নিদগ্ধ শঙ্খচক্রাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহাকে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত জানিয়া জীবিতাবস্থাতেই ত্যাগ করিবে। উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রামানুজ স্বামীর বৈষ্ণব মত প্রচারের পরে, লিঙ্গপুরাণ লিখিত হইয়াছে। কারণ "প্রাপ্তিসত্বাং নিষেধঃ" অর্থাৎ নিষেধ বাক্য, পূর্ব্বে কোন একটী ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেই, প্রয়োগ করা যায়, নচেৎ নহে। এই লিঙ্গপুরাণের নাম প্রায় সমস্ত পুরাণেই পাওয়া যায়। সুতরাং লিঙ্গ পুরাণের পরেই যে অন্যান্য পুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা একপ্রকার সপ্রমাণ হয়। আরও রামানুজ স্বামী প্রায় ৭৫০ সাতশত পঞ্চাশ বৎসর গত হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং লিঙ্গ ও অন্যান্য যে ৭৫০ বৎসরেরও ন্যূন কাল হইতে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্যাসদেব পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ব্যাসদেব রামানুজ স্বামীরও পরে কখনই জীবিত থাকিতে পারেন না। এইজন্য ব্যাসদেবের পুরাণকর্ত্তা হওয়া অসম্ভব।

৩। অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ মধ্যে বহুসংখ্যক পরস্পরবিরোধী বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ ব্যাসদেবেরই রচিত

হইত, তবে তাহাতে কখনই এরূপ পরস্পরবিরোধী বাক্য থাকিতে পারিত না। অতএব সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ যে ব্যাসের রচিত নহে, ইহাও তাহার অন্যতর প্রমাণ।*

৪। আরও দেখা যায় জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ তৌজুকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, গোল আলু, তামাক ও কোপী, এই তিন দ্রব্য তাহার পিতা আকবর সাহার সময়ে জনৈক পাদরী কর্ত্তৃক মার্কিন দেশ হইতে আনীত হইয়া ভারতে রোপিত হয়। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারাও একবাক্যে একথা স্বীকার করেন। এখন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তামাক সেবনের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে * * * *।
তমালং ভক্ষিতং যেন স গচ্ছোরকার্ণবে॥"

অর্থাৎ এই ঘোর কলিযুগে চাতুর্বর্ণের লোক ও অপরে যে কেহ তামাক সেবন করিবে সে নরকে যাইবে।

পুনশ্চ পদ্মপুরাণে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হই—

"ধূম্রপানরতং বিপ্রমিত্যাদি।"

ইহাতেও তামাক সেবনের কথা আছে। উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়

---

*অষ্টাদশ মহাপুরাণ যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, বৃহন্নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ উপপুরাণ যথা—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসা, কপিল, নারদ, নন্দিকেশ্বর, শুক্র বা উষনস, বরুণ, সাংখ্য, কল্কি, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচ ও ভাস্কর।

মতান্তরে আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমথাপরং
তৃতীয়াংস্কন্দমুদ্দিষ্টং কুমারেণ তু ভাষিত
চতুর্থ শিবধর্ম্মাখ্যাং সাক্ষাৎ নন্দীশ ভাষিতং॥
দুর্ব্বাসসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তং মতঃ পরং
কপিলং বামনঞ্চৈবং তথৈ বোসন সেবিতং
ব্রহ্মাণ্ডং বরুণঞ্চাথ কালিকাহ্বয় মেবচ
মহেশ্বর তথা শাম্বং গৌরং সর্ব্বার্থ সঞ্চয়ঃ
পরাশরোক্ত মপরং মরীচং ভার্গবাহ্বয়ং॥

যে, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও পদ্ম পুরাণ অবশ্যই এদেশে তামাক প্রচলিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের কোন প্রাচীন গ্রন্থে তামাকের বিষয়ে কিছুই লিখিত নাই। বিশেষতঃ, তামাল বা তামাক, এই শব্দটী আমেরিকা দেশীয় আদি নিবাসীদিগের ভাষা হইতে গৃহীত।

অতএব তামাক শব্দ কোন আর্য গ্রন্থে থাকিতে পারে না। শিখ্ গুরুদিগের মধ্যে মহাত্মা নানক হইতে নবম গুরু পর্য্যন্ত কেহই তামাক সেবন বিষয়ে নিষেধ বাক্য কিছুই প্রয়োগ করেন নাই; কারণ তাঁহাদিগের সময়ে তামাক তত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের সময়ে পাঞ্জাবে অতিরিক্ত পরিমাণে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতেই, তিনি তামাক সেবন নিষেধ করেন। এখন আকবর সাহা প্রায় তিন শত বৎসর হইল পরলোকগত হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও পদ্ম পুরাণে যখন তামাকের কথা লিখিত আছে তখন তাহা যে কত নবীন গ্রন্থ, তাহা ইহাতেই প্রমাণ হয়। এইজন্য বলা যাইতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড ও পদ্মপুরাণাদি ব্যাসের রচিত নহে।

৫। শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক ভগবান শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেবের পরে ও রামানুজ স্বামীর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ শঙ্কর স্বামী, বৌদ্ধ ও জৈন মত খণ্ডন করেন ও রামানুজ শঙ্কর স্বামীর মতের প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, শঙ্কর স্বামীই সর্ব্বাগ্রে মায়াবাদ ভারতবর্ষে প্রচার করেন। এবং এই শঙ্করাচার্য্যকে হিন্দু মাত্রেই, শঙ্করের অংশ বা অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ শঙ্কর বা শিব বলিয়া মানিয়া থাকেন। এখন পদ্মপুরাণে উমামহেশ্বর সংবাদে লিখিত আছে—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিনা॥"

অর্থাৎ হে পার্ব্বতি! কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া মায়াবাদরূপ মিথ্যাবেদান্ত শাস্ত্র, যাহা বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত, প্রচার করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়া দেখ যে, পদ্মপুরাণ বুদ্ধদেব ও শঙ্কর স্বামীর পরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

৬। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা একমত হইয়া স্বীকার করেন যে, উড়িষ্যা দেশে

জগন্নাথের মন্দির ও দারুময়ী মূর্ত্তি, বিক্রমী ১২৩১ সম্বতে রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে জগন্নাথের মন্দিরাদি কিছুই ছিল না। আমরা স্কন্দপুরাণে এই জগন্নাথ ও মন্দিরাদি দর্শনের মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। মন্দিরের গায়ে যে সম্বৎ লেখা আছে, তাহাও পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতের সহিত ঐক্য হয়। অতএব স্কন্দপুরাণ যে জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের পর লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইল। সুতরাং এত নবীন পুরাণ কদাপি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইতে পারে না। পুনশ্চ মহাভারত গ্রন্থ মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের রচিত। এই গ্রন্থ যে পুরাণ সকলের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহার মুখ্য প্রমাণ এই যে, সমগ্র মহাভারতে কোন পুরাণের নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু পুরাণের ভূরি ভূরি স্থানে মহাভারতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। এখন ভাগবত পুরাণ যে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে, তাহাই প্রমাণ করা আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন যে, ভাগবত শাস্ত্র শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে গঙ্গাতীরে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। ইতিহাস ও মহাভারত গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে যে, কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর ৮ মাস ২৫ দিবস রাজ্য করেন ও তৎপরে মহারাজ পরীক্ষিৎ ৬০ ষাট বৎসর রাজ্য করেন। এই ভাগবত শাস্ত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের প্রায় ৯৬ বৎসর পরে ভাগবত শাস্ত্র শুকদেব কর্ত্তৃক কথিত হয়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের ৩৩২ ও ৩৩ অধ্যায়ে স্পষ্টই লিখিত আছে যে যখন পিতামহ ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠির মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ লন, তখন ভীষ্মদেব শুকদেবের জন্ম ও মরণবৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করান্। অর্থাৎ সেই বৃত্তান্তে শুকদেব যে যুধিষ্ঠিরের অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট লেখা আছে। যথা—

অন্তর্হিতঃ প্রভাবন্ত দর্শয়িত্বা শুকস্তদা"
"গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যাগমৎ পরম্॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শুকদেব অন্তর্হিত হইয়া আপনার প্রভাব দেখাইয়া, এইরূপে শব্দাদি গুণ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই পরম পদ লাভ করিলেন। এই ঘটনার পরে, মহর্ষি বেদব্যাস অত্যন্ত পুত্র-শোকাতুর হইয়া, ভয়ানক ক্রন্দন

করিতে লাগিলেন। এমন সময় পিনাকপাণি মহাদেব ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বিশেষ রূপে সান্ত্বনা করেন যথা—

"তং দেবগন্ধর্ব্ববৃতো মহর্ষিগণপূজিতঃ"
"পিনাকহস্তো ভগবানভ্যাগচ্ছত শঙ্করঃ॥
তমুবাচ মহাদেবঃ শান্তপূর্ব্বমিদং বচঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা॥
অগ্নের্ভূমেরপাং বায়োরন্তরিক্ষস্য চৈবহ।
বীর্যেণ সদৃশঃ পুত্রঃ পুরা মত্তস্ত্বয়া বৃতঃ॥
স তথালক্ষণো জাতস্তপসা তব সম্ভবঃ।
মম চৈব প্রসাদেন ব্রহ্মতেজোময়ঃ শুচিঃ॥
সগতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপ্তামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে তং ত্বং কিমনুশোচসি॥
যাবস্থাস্যান্তি গিরয়ো যাবস্থাস্যান্তি সাগরাঃ।
তাবত্তবাক্ষয়া কীর্ত্তিঃ সপুত্রস্য ভবিষ্যতি॥'

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

মহর্ষিগণপূজিত ভগবান পিনাকপাণি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, পুত্রশোকার্ত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট আগমন পূর্ব্বক, সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহারে কহিলেন মহর্ষে! পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্যাসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে ; আমিও তোমায় প্রার্থনানুযায়ী পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র, দেবদুর্ল্লভ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াচেন। অতএব কিজন্য তুমি অনুতাপ করিতেছ। সাগর ও পর্ব্বত সমুদয় যে পর্যান্ত এই ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তির ঘোষণা হইবে।

উপর্য্যুক্ত মহাভারতের বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শুকদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনেক পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। অতএব যুধিষ্ঠিরের এই শুকদেবের জন্ম ও মরণ সংবাদ শুনিবার প্রায় এক শত বর্ষ পরে, পরীক্ষিৎকে কিরূপে শুকাচার্য্য কর্ত্তৃক ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করান সম্ভব হইতে পারে। যে লোক, পরীক্ষিৎ, এমন কি যুধিষ্ঠিরেরও জন্মাইবার পূর্ব্বে

দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কিরূপে পরীক্ষিতের মৃত্যুর সময় ভাগবত শুনাইতে সক্ষম হইবেন।

অতএব যদি ভাগবত ব্যাসদেব কর্ত্তৃক লিখিত হইত, তবে কখনই মহাভারতের সহিত এইরূপ বিরোধী হইতে পারিত না।

পুনশ্চ ভাগবতে লিখিত আছে যে, যখন শুকদেব ভাগবত শ্রবণ করান, তখন তাহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র ছিল। যথা—

"তত্রাভবদ্ভবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়াগামটমানোঽনপেক্ষঃ।"
"অলক্ষালিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈবরধূত বেশঃ॥"
"তং দ্বাষ্টবর্ষং সুকুমারপাদং করোরুবাহুং সুকপোল গাত্রং॥"

ভাগবত ১।১৯।২৪১৪।

অর্থাৎ সেই সময় ভগবান ব্যাসপুত্র শুকদেব, যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্যাটন করিতে করিতে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে কোন আশ্রমের চিহ্ন ছিল না ও কতকগুলা বালক, চারিদিকে বেষ্টন করিয়া, কৌতুক করিতেছিল। তাহার বেশ দ্বারা এই প্রকার বোধ হইতেছিল, যেন লোকেরা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র ; কর, চরণ, উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং গাত্র, অতিশয় কোমল ইত্যাদি—

এখন বিচার করিয়া দেখুন যে, যদি ভাগবত ব্যাখ্যা কালে, শুক দেবের বয়ঃক্রম মোটে ষোল বৎসর হয় তবে, তিনি যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে কদাচ জীবিত থাকিতে পারেন না। অতএব ইহা মহাভারতের সহিত সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি মহাভারত ও ভাগবত এক ব্যাসদেবেরই লেখা হইত, তাহা হইলে, কখন এরূপ অসঙ্গত বাক্য ভাগবতে থাকিতে পারিত না।

দেবী ভাগবতের টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভাগবত গ্রন্থ বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত।

ভাগবত গ্রন্থে এত অসম্ভব বাক্য লিখিত আছে যে, তাহাকে কদাচ ঋষি প্রণীত গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। আমি দুই একটি উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি যথা ঃ—নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। তখন

প্রহ্লাদ বলিলেন—

ভাগবত শ্লোক

"বরং বরয় এতৎতে বরদেশান্মহেশ্বরাৎ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্॥"

... ...

"তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্দুস্তরাদঘাৎ।
পূতস্তেঽপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিঃ সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধো হস্য কুলেজাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥

ভাগবত ৭ স্কন্ধ।

প্রহ্লাদ বলিলেন হে মহেশ্বর! আপনি বর দিতে চাহিতেছেন, অতএব আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজ না জানিয়া, যে সকল নিন্দা করিয়াছেন, তত্তৎ ক্রিয়া জন্য, দুরন্তর ও দুস্তর পাপ হইতে তিনি মুক্ত ও পূত হউন। ভগবন্! যদিও আপনার নেত্রপথবর্ত্তী হওয়াতেই, আমার পিতা পবিত্র হইয়া গিয়াছেন, তথাপি কৃপণতাপ্রযুক্ত আমি এই প্রার্থনা করিলাম। ভগবান বলিলেন হে অনঘ! কেবল তোমার পিতা পবিত্রীকৃত হয় নাই। তাহার পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষও পবিত্র হইয়াছে, যেহেতু তুমি তাহার কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে সাধু! তুমি তোমার পিতার কুলপাবন পুত্র। এখন যে গ্রন্থ ভগবানের বাক্যকে অযথা করে, সে গ্রন্থ যে কতদূর গ্রহণীয়, তাহা আপনারা বুঝিয়া লউন। ভাগবতের মতে, ব্রহ্মা হইতে প্রহ্লাদ পর্য্যন্ত মোটে চারি পুরুষ। যথা ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু এই তিন পুরুষ ও চতুর্থ প্রহ্লাদ। অতএব কিরূপে প্রহ্লাদের পূর্ব্বতন একুশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেলেন। এইজন্য এরূপ বাক্য ভগবানের মুখ দিয়া বাহির করান ভাল হয় নাই। পুনশ্চ ভগবানের এই কথায় আরও একটি মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। যদি হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু বাস্তবিকই মুক্ত হইল, তবে কিজন্য জন্মান্তরে তাহাদিগকে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল ও দন্তবক্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। এইরূপে ভাগবতের আর একস্থানে লিখিত আছে "ভবান্ কল্প

বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মাকে বিষ্ণু বর প্রদান করিলেন যে, তুমি কল্প অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ও বিকল্প অর্থাৎ প্রলয়কালে কখনই, মোহ প্রাপ্ত হইয়া বৎসা হরণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি—

ভাগবতে আরও লিখিত আছে যে হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় মুড়িয়া মস্তকের উপাধান অর্থাৎ বালিশ করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, বিষ্ণু, বরাহ অর্থাৎ শূকরের রূপে অবতীর্ণ হইয়া, হিরণ্যাক্ষের নিকটে গমন করিলেন ও নিজ দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে হিরণ্যাক্ষের মস্তকের নিম্ন হইতে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে দুইজনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এক্ষণে বক্তব্য এই যে, পৌরাণিক মহাশয়েরা পৃথিবী যে গোলাকার, ইহা পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না; তৎপরে যদি পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় মুড়িয়ে মস্তকে রাখিয়া হিরণ্যাক্ষ শয়ন করিল, তবে সে কোথায় শয়ন করিল? এবং বিষ্ণুই বা কোথায় আসিলেন? ও যখন বরাহরূপী বিষ্ণুর দন্তে পৃথিবী রহিল, তখন দুইজনের যুদ্ধ কোন্ স্থানে হইল? নিরবতাই ইহার প্রকৃত উত্তর। তৎপরে ভাগবতে লিখিত আছে যে পুতনা রাক্ষসীর শরীর ছয় ক্রোশ পরিমাণ পরিসর ও তদনুযায়ী দীর্ঘ ছিল; যদি ইহা সত্য হয় তবে তাহার মৃত শরীর দ্বারা মথুরা হইতে গোকুল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ চাপা পড়িত সন্দেহ নাই।

ভাগবতের অন্য স্থানে লিখিত আছে যে, প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্র এত দীর্ঘ ছিল যে, তাহার নেমি দ্বারা সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপরে অপর পুরাণে লিখিত আছে যে, সগররাজার পুত্রেরা সাগর খনন করিয়াছিলেন। পুনশ্চ ভাগবতে লিখিত আছে যে, অজামীল নামে এক মহাপাপী ছিল, সে নারদের কথায় আপন পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল; মৃত্যুকালে অজামীল, তাহার পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিল, এমন সময় স্বয়ং ভগবান নারায়ণ, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন বক্তব্য এই যে, স্বয়ং নারায়ণ যদি অন্তর্যামী হইতেন, তাহা হইলে অপর একজনকে ডাকিলে, তিনি কখনই তথায় উপস্থিত হইতেন না। যখন তাঁহার এই সামান্য জ্ঞান নাই যে, তাঁহাকে ডাকিতেছে কি অপর কাহাকেও ডাকিতেছে, তখন তিনি কিরূপে জীবের পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাহাদিগকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করাইতে সমর্থ হইবেন। আর যদি এরূপ বলা যায় যে, ইহাতে নামমাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাও হইতে পারে না। অথবা যদি এরূপ বলা যায় যে, লোককে নামে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এরূপ

লেখা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ এইরূপ বলায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যদি লোকের এরূপ অন্যায় ধারণা জন্মে যে, তাহারা যতই পাপ করুক না কেন, এক একবার হরিনাম করিলেই, তাহা ভস্ম হইয়া যাইবে, তাহা হইলে লোকে হরিনাম বা গঙ্গাস্নান করিলে, অথবা হরিনাম জপ করিলেই তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। বলিতে কি, এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস লোককে অনর্থক পাপকার্যে রত করিয়া থাকে ; এবং এই অন্যায় বিশ্বাসের কারণে, এদেশে অনেকে সমস্ত দিন পাপকার্য্যে রত থাকিয়া, সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্ত্তন বা মালা লইয়া রাম বা হরিনাম জপ করিয়া, পাপ কাটাইয়া থাকেন। অনেকে রাত্রিতে পরদারাদি পাপ করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হন মনে করেন। বলিতে কি, এরূপ লোকে গঙ্গাস্নান ও হরিনাম আদিকে পাপরূপ অজীর্ণের হজমীগুলির ন্যায় গণ্য করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে আবার অনেকের এরূপ সরল বিশ্বাস যে, লোকে মিথ্যা স্তুতি বা চাটু বাক্য দ্বারা প্রশংসা পূর্ব্বক ধনবান মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে যেরূপ কার্য্যসিদ্ধি করেন, অথবা রাজদ্বারে উৎকোচগ্রাহী শান্তিরক্ষকাদি কর্ম্মচারীদিগকে, অভিলষিত উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক যেরূপ যদিচ্ছাচরণে সমর্থ হন, তদ্রূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রুদ্র আদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদিগকে, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন রুচ্যানুসারে, বিবিধ প্রকার বস্ত্র, পুষ্প, ফল, পত্র, নৈবেদ্য, ছাগ, মহিষ, সুরা, বিজয়া ও অপরাপর দ্রব্য অর্পণ পূর্ব্বক এবং তাহাদিগের শ্রবণপ্রিয় বিবিধ উৎকট শব্দ ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা, পূজা করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন। কেহ রোগগ্রস্থ হইলে, যেরূপ চিকিৎসকের সহিত ফুরান করা হয় যে, আপনি এই রোগ আরোগ্য করিলে, আপনাকে এত টাকা পারিতোষিক দিব, তদ্রূপ আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাটীতে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, লোকে কালী বাড়ীতে জোড়া পাঁঠা, হরির নিকট হরিলুট অথবা তারকেশ্বরাদি মহাদেবের নিকট পাঁচ পয়সা, পাঁচ আনা, ষোল আনা বা পাঁচ সিকার পূজা মানত করেন ও এই সকল দেবতাদিগকে প্রার্থনা করেন যে, হে কালীমাতা! বা হে হরিদেব! অথবা হে বাবা তারকনাথ! আপনি যদি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তবে আমি আপনার এইরূপে (অর্থাৎ যেরূপ মানত করিয়াছেন তদ্রূপে) পূজা দিব। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার করুন। সাধারণ লোকে মনে করেন যে, দেবতারা পূজা পাইবার

জন্য পেট ধুইয়া বসিয়া আছেন, আমরা খাইতে দিলেই, তাহারা খাইতে পাইবেন, নচেৎ নিজ চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদিগের আহার জুটে না। অনেকে আবার অপরের প্রতি দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার করিয়া, মহাদেবাদি বিগ্রহের সম্মুখে মাথা কুটিয়া অথবা দেবী মূর্ত্তির অগ্রে মদ্য মাংসাদি রাখিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহাকে অর্পণ করতঃ চণ্ডি পাঠাদি করিয়া অন্যায় জয় লাভের প্রত্যাশা করেন। এই সকল লোকেরা ঈশ্বরের নিকট মনের দুষ্ট ভাব লুক্কায়িত রাখিয়া, ঈশ্বরকে লোভ দেখাইয়া অথবা ঈশ্বরকে খোসামোদে বশ করিয়া নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতে চাহেন। ইঁহারা মনে করেন যে, ডুবিয়া জল খাইলে শিবের বাবাও জানিতে পারে না। আমি একথা বলি না যে, বিপদে পড়িলে বা অপর সময়ে ঈশ্বরকে ডাকা উচিত নহে। ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ, তিনিই আমাদিগের অনন্যগতি এবং তিনিই আমাদিগের শান্তি প্রাপ্তির একমাত্র আধার। অতএব তাঁহাকে ডাকা বা উপাসনা করা উচিত নহে, একথা কোন্ মুখে বলিবে? আমি এস্থলে এই মাত্র বলিতে চাহি যে, সেই অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে পাইয়া অথবা কিছু ঘুষের লোভ দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রয়াস পাওয়া, মোহের কর্ম্ম ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদিগের দেশে ঠাকুরকে ঘুষ খাওয়ান প্রথা প্রচলিত হইয়া যে কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা আমি লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহি। মারণ, বশীকরণ, উচাটনাদি বামাচার প্রথা, এই ভ্রান্তি বিশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সচরাচর ধূর্ত্ত মহাশয়েরা, ছল ও কৌশলে, বিষ প্রয়োগাদি করিয়া, লোককে হত্যা করতঃ, মারণ সিদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মূর্খলোকদিগকে ঠকাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যদি মারণ সত্য হইত, তবে ইংরাজেরা নির্ব্বিঘ্নে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সহকারে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতেন না। ইংরাজদিগের বন্দুক ও কামানের সম্মুখে মারণ মন্ত্রের ফট্‌ফট্ খাটে না ; খাটাইতে গেলেও, কারাগার ও ফাঁসি কাষ্ঠরূপ, মারণমন্ত্রতাড়নদণ্ড প্রস্তুত থাকে। আধুনিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধূর্ত্ত মহাশয়েরা ভারতবাসীদিগকে ঠকাইবার জন্য গুটিকত কপোল কল্পিত প্রমাণ প্রয়োগ করেন যথা—

"দেবাধীনং জগৎসর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ দৈবতম্।" ইত্যাদি

অর্থাৎ সমগ্র জগৎ দেবতার অধীন, দেবতা মন্ত্রের অধীন, ও মন্ত্র ব্রাহ্মণের

অধীন, অতএব ব্রাহ্মণই দেবতা; অর্থাৎ দেবতাদিগের অধীনে সমস্ত পদার্থ আছে। সেই দেবতারা মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হন, ও সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণেরাই দেবতা। এখন আমি এইরূপ ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, হে ব্রাহ্মণ! যদি আপনার অধীনে দেবতা বশীভূত হন, এরূপ মন্ত্রই আছে তবে আপনি কিজন্য যজমানের নিকট হইতে সামান্য অর্থহেতু লালায়িত হন? ও কিজন্যই বা, একজন নিরপরাধী ব্যক্তির অপকার করিয়া, যজমানের অন্যায় উপকার করিতে প্রবৃত্ত হন? যখন আপনার হস্তে মন্ত্র মন্ত্রের অধীনে দেবতা উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন আপনি ইচ্ছা করিলেই, বাঞ্ছানুরূপ বিভব প্রাপ্ত হইতে পারেন। এরূপ বিভব সত্ত্বেও, আপনি কিজন্য, সামান্য বিষয়ে লোভ করিয়া মহাপাতক সংগ্রহ করিতেছেন? আমাদিগের দেশের লোকেরা, মোহের এতদূর বশীভূত হইয়াছেন যে, উপরোক্ত সামান্য বিচার করিতেও তাঁহাদিগের কষ্ট বোধ হয়, অথচ এইরূপ ধূর্ত্ত পাষণ্ডদিগকে প্রচুর অর্থ দিতে কাতর নহেন। ঈশ্বর অন্তর্যামী, তিনিই একমাত্র পূর্ণজ্ঞানী ও সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহাকে যে প্রশংসা বাক্য দ্বারা স্তব করিবার চেষ্টা করিব, তিনি তাহা অর্থাৎ সেই প্রশংসা বাক্য হইতেও অত্যন্ত মহৎ। যদি আমরা মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মাতা (যিনি সমগ্র জগতের ষষ্ঠাংশের অধিপতি), তাহাকে একটি সামান্য পর্ণ কুটীরের অধিপতি বলিয়া সম্মান করি, তবে তিনি কি তাহাতে কৃতকৃত্যা হইবেন? কখনই নহে। তদ্রূপ যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি অপরিসীম বল ও পরাক্রম সম্পন্ন, তাঁহাকে যে কথা দ্বারা বর্ণন করিব, তিনি তদপেক্ষা অধিক; অতএব কেবল স্তুতি বাক্য দ্বারা তাঁহার মন গলাইয়া, স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রয়াস পাওয়া যে মোহের কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি। অনেক সময় আমরা মিথ্যা ভয় প্রযুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত দেবতার উপাসনা ও পূজা করিয়া থাকি, যথা—শীতলা দেবীকে পূজা বা প্রণামাদি করি, যাহাতে দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্ত বা মসূরিকা রোগ প্রেরণ না করেন। মনসাকে পূজা করি, সর্পাঘাত নিবারণ জন্য। ওলা বিবির পূজা দেই, ওলাউঠার ভয়ে ইত্যাদি। যেরূপ আমরা অনেক সময়ে, দুষ্ট চরিত্রযুক্ত গুণ্ডাদিকে অর্থ প্রদান করি, পাছে আমাদিগের উপর অত্যাচার করে, সেইরূপ উপরোক্ত কতকগুলি কল্পিত দেবতাদিগের নিকট হইতে, কোন উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, পাছে কেবল অপকার প্রাপ্ত হই, এই আশঙ্কায় তাহাদের পূজা করা হয়। যখন জীব সেই

পরম দেবতাকে জানিতে পারেন, এবং তাঁহারই উপাসনা করেন, তখন আর সেই কল্পিত দেবতার প্রতি তাহার ভয় থাকে না। উপনিষদে লিখিত আছে,—"আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ॥" অর্থাৎ আনন্দময় পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, তাঁহার আর কোন বিষয় ভয় থাকে না। তখন তিনি একে বারে শঙ্কাশূন্য হন। যাঁহারা সেই পরম দেবতাকে জানেন না, তাঁহারাই অনর্থক ভ্রমে পতিত হইয়া বেড়ান, ও সেই মিথ্যা ভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য, কল্পিত পৌরাণিক দেবতাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আরও অন্ধকারে পতিত হন। যজুর্ব্বেদীয় শতপথ গ্রন্থে লিখিত আছে—"যোন্যাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ যথা পশুরের স দেবানান্॥" ইহার তাৎপর্য্য এই, যিনি সেই পরম দেবতাকে উপাসনা না করিয়া, অন্য কল্পিত দেবতার উপাসনা করেন, তিনি পণ্ডিতদিগের মতে পশুরূপে গণ্য হন। যাহা হউক, আমি প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অপর বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি এজন্য পুনরায় ভাগবত প্রসঙ্গ বিষয় লিখিতেছি।

হেমাদ্রি নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে যে, জয়দেবের ভ্রাতা বোপদেব (যিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন) একদা রাজার সচিব হেমাদ্রিকে নিজকৃত ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রদান করিলে, হেমাদ্রি বলিলেন যে, তোমার কৃত ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিবার আমার অবকাশ নাই; এজন্য তুমি সংক্ষেপতঃ শ্লোক দ্বারা সূচিপত্র প্রণয়ন কর, যাহা পাঠ করিয়া আমি তোমার কৃত ভাগবতের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইব। বোপদেব তাহার আজ্ঞানুসারে সূচি পত্রের যে সকল শ্লোক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুটিকত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

শ্রীমদ্ভাগবত – সূচিপত্র

বোধয়ংতীতিহি প্রাহুঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ।
পঞ্চ প্রশ্নাঃ শৌনকস্য সূতস্যাত্রোত্তরং ত্রিষু॥
প্রশ্নাঽবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্যানিবৃত্তিঃ কৃতান্।
নারদস্যাত্র হেতুক্তিঃ প্রতীতার্থং স্বজন্ম চ॥
সুপ্তঘ্নং দ্রোণ্যাভিভবস্তদস্ত্রাৎপাণ্ডবা বনম্।
ভীষ্মস্য স্বপদ প্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্যদ্বারিকাগমঃ॥
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ।
কৃষ্ণ মর্ত্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থ মহাপথঃ॥

ইত্যষ্টা দশভিঃ পাদৈরধ্যায়ার্থঃ ক্রমাৎস্মৃতঃ।
স্বপরপ্রতিবং ধ্যেনং শ্মীতং রাজং জহৌনৃপঃ॥
ইতি বৈরাজ্ঞো দাত্যাক্তৌ প্রোক্তা দ্রোণিজয়াদয়ঃ।
ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ।

বিস্তারিত দেখিবার ইচ্ছা হইলে, হেমাদ্রিগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন।

তৎপরে আপনারা আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিলেন, একদা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, স্ত্রীপুরুষে এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ও বিষ্ণু দ্বারীকে আজ্ঞা দিলেন, যে তুমি দ্বার রক্ষা কর, কাহাকেও আসিতে দিও না। সনক ঋষি বৈকুণ্ঠবাসী (সর্ব্বব্যাপী নহে) শরীরি ভগবানের দর্শনাভিলাষে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। দ্বারী মুনিকে বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, প্রভু ও দেবী, এ সময় শয়নে রহিয়াছেন, আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন, জাগরিত হইলে সাক্ষাৎ হইবে। এই কথা শুনিয়া, সনক ঋষি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন আমার কোন স্থান অগম্য নাই, অতএব রে দুরাত্মাগণ! তোমরা পৃথিবীতে গিয়া দৈত্য ও দানব রূপে জন্মগ্রহণ কর, এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। দ্বারীগণ ঋষির চরণে পতিত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিল ও বলিল যে, আমরা কোন অপরাধ করি নাই, অতএব আমাদিগকে কিজন্য আপনি অনর্থক শাপ প্রদান করিলেন। আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র, বিশেষতঃ আপনাকে কোন কটুবাক্য বলি নাই। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় নারায়ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি সনকাদিকে কিছু বলিলেন না, বরং অত্যন্ত যত্ন ও আদরের সহিত তাহাদের সৎকার করিলেন। দ্বারী কাঁদিয়া সমস্ত জানাইল, তাহাতে ভগবান বলিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণের কথার অন্যথা করিতে পারি না, তোমাদিগকে ঐরূপ যোনি গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে এই মাত্র দয়া করিতে পারি যে, তোমরা যদি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে প্রস্তুত হও, তবে তিন জন্মের পর, তোমাদের উদ্ধার হইবে; আর যদি মিত্ররূপে থাকিতে চাহ তবে, সপ্তম জন্মের পর বৈকুণ্ঠে পুনঃ আসিতে পারিবে। এমন বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ পৌরাণিক গোলক বা বৈকুণ্ঠ রাগদ্বেষ পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত ছিল, সেখানে শান্তির বড়ই অভাব ছিল সন্দেহ নাই। তৎপরে সনক-ঋষি, যাঁহাকে পুরাণে জীবনমুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তিনি জীবনমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মহা ক্রোধী ও অজ্ঞানী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র

সন্দেহ নাই; কারণ তিনি পরমাত্মাকে শরীরি ও একস্থানব্যাপী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। যদি এরূপ বলা যায় যে, তাহার সর্ব্বত্র গমন ছিল, ও তিনি পরমাত্মার পূর্ণ ভক্ত ছিলেন, তাহাও হইতে পারেন নাই কারণ তিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি অত্যন্ত বেল্লিকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেলেন; কারণ স্ত্রীপুরুষ যেখানে একত্রে শয়ন করিয়া আছেন তথায়, বিনানুমতিতে প্রবেশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। যদি এইরূপ বলা যায় যে, তাহার স্ত্রীপুরুষের জ্ঞান ছিল না, তিনি সমস্তই পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন করিতেন, তাহাও হইতে পারে না; কারণ তিনি দ্বারীর সামান্য কথায়, একবারেই ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার (পরমাত্মার) বাটী, ঘর, শয়নাগার আদির জ্ঞান ছিল, (কারণ যদি তাহা না থাকিত তবে, তিনি কিজন্য বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু দর্শনার্থে গিয়াছিলেন)। তিনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাই যে বিষ্ণু, তাহা জানিতেন না, কারণ তাহা হইলে তিনি নিজ অন্তরেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। তৎপরে জয়-বিজয়ের কোন অপরাধ ছিল না। তাহারা প্রভুর বিশেষতঃ ভগবানের আজ্ঞা পালন করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহাদিগকে ঋষি শাপ প্রদান করিলেন। পৌরাণিক ভগবান, ন্যায় অন্যায় কোন বিষয় বিচার না করিয়া বরং নিরীহ দ্বারীদিগকেই দণ্ড দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অতএব পৌরাণিক ভগবান যে ভয়ানক অন্যায়কারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ভগবান যথার্থ ন্যায়বলম্বী হইতেন, তবে তিনি অবশ্যই সনক ঋষিকে দণ্ডবিধান ও শিক্ষা দিতে ত্রুটী করিতেন না। নারায়ণের জয় বিজয়ের স্থানে, সনকাদিকে পৃথিবীতে অধম যোনি প্রাপ্ত করান উচিত ছিল। পৌরাণিক ভগবানের আজ্ঞা পালন করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহাদের বর্ণিত ভগবানের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, অন্যায়কারীকে দণ্ড দিতে সমর্থ হন। তিনি তাহার ভক্তকে, দুষ্ট অন্যায়কারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, এজন্য পুরাণের লিখিত ভগবানের উপাসনা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন ও যোগ শাস্ত্রের ভাষ্য করিয়াছিলেন। তিনি মহান্ বেদজ্ঞ হইয়া, এরূপ অন্যায় কথা কদাপি লিখিতে পারেন না; এজন্য ভাগবত কদাপি ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে ও হইতে পারে না।

কোন একটী নবীন পুরাণে লিখিত আছে যে, এক সময় মহর্ষি নারদ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বদরিকাশ্রমে বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তখন বিষ্ণু সেখানে

তপস্যা করিতেছিলেন। নারদ যাইবা মাত্রই, বিষ্ণু সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন যে, ম্লেচ্ছেরা মহাদেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ও মহাদেব জ্ঞানবাপী কূপে ঝাঁপ দিয়াছেন। এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন যে, দুরাত্মা আরঙ্গজীবের সময়েই কাশীর মন্দির ধ্বংস করা হয়, এবং তৎকালেই বিশ্বনাথ জ্ঞানবাপীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। এখন এই ঘটনা প্রায় ২০০ বৎসর হইল ঘটিয়াছে, অতএব উক্ত পুরাণ অবশ্য ২০০ বৎসর মধ্যেই রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব এরূপ গ্রন্থের প্রণেতা কদাপি ব্যাসদেব হইতে পারেন না।

তৎপরে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাকে পৌরাণিক মহাশয়েরা তপস্যা করাইয়া থাকেন। বিষ্ণু যিনি সর্ব্বোচ্চ দেব, তিনি আবার কাহার উপাসনা করিবেন? তাহার পর পৃথিবীতে, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টিতে কি ঘটনা ঘটিতেছে, তদ্বিষয় তিনি জ্ঞাত নহেন; এমন কি, এক জন সাধক যোগী পুরুষ, ধ্যানবলে অপর স্থানের বিষয় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, পরন্তু পৌরাণিক সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা ঐ শক্তি হইতেও বঞ্চিত আছেন। এরূপভাবে ঈশ্বরকে বর্ণন করা কি তাঁহার অবমাননা করা নহে? পরন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সমস্ত মিথ্যাকল্পিত গল্প লইয়া, আমাদিগের দেশীয় লোকেরা অন্ধ বিশ্বাসে ইহারই ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন।

অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণে ঈশ্বর, ঋষি, মুনি ও দেবতা আদি শ্রেষ্ঠ জীব মাত্রকেই, ইন্দ্রিয়াদি ব্যভিচার দোষে দুষিত করিতে ক্রটী করেন নাই। বিশেষতঃ গীতাধ্যায়ে ব্যাসদেব যাঁহাকে পরম যোগী ও জ্ঞানী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাঁহাকে কাম ক্রোধের অতীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকেই পুরাণে, ব্যভিচার দোষের দূষিত ও দুষ্টের একশেষ করিয়া বর্ণন করিতে ক্রটী করেন নাই। অধিক কি বলিব, পুরাণে ব্রহ্মাকে আপন কন্যার সহিত, শ্রীকৃষ্ণকে কুব্জা, রাধিকা আদি অপর গোপাঙ্গনার সহিত, ব্যভিচারে দূষিত করিয়াছেন। যোগেশ্বর মহাদেব, যিনি মদনকে ভস্ম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, (অবশ্য একথা পুরাণেই এরূপ লিখিত আছে) অর্থাৎ যিনি কামরিপুকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাকেও ঋষিপত্নীদিগের সহিত ব্যভিচার দোষে দূষিত করিয়াছেন। এইরূপে ইন্দ্রকে মাতাপেক্ষা গুর্ব্বিণী গুরু পত্নীর

সহিত, বিষ্ণুকে জালন্দর পত্নী ও মহাসতী বৃন্দার সহিত, সূর্য্যকে কুন্তির সহিত, পবনকে অঞ্জনার সহিত, বরুণকে উর্ব্বসীর সহিত, চন্দ্রকে তাহার গুরুপত্নী তারার সহিত, দেবগুরু বৃহস্পতিকে উত্তরার সহিত, বিশ্বামিত্রকে উর্ব্বসীর সহিত, পরাশরকে মৎস্যগন্ধার সহিত ব্যভিচার দোষে দুষিত করিয়াছেন ইত্যাদি। আমি অধিক আর কি লিখিব, আধুনিক পৌরাণিক হিন্দুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য যে দেবতা, অর্থাৎ শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ, এই দুইটির যদি পৌরাণিক উৎপত্তি বিষয়ে বর্ণন করা যায়, তবেই আপনারা জানিতে পারিবেন যে, হিন্দুরা বেদ বিরুদ্ধ পুরাণ আশ্রয় করিয়া, কতদূর হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছেন ও কতদূর নষ্ট, ভ্রষ্ট ও অশ্লীল পদার্থকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেছেন। আমি পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে শিবলিঙ্গ, তুলসী ও শালগ্রামের উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণের মত, নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

তুলসীর উৎপত্তি।

গোলোকে ইয়ং তুলসী গোপী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, শ্রীকৃষ্ণেন সহ অস্যাঃ ক্রীড়াং দৃষ্টা রাধা শশাপ, ত্বং মানবীং যোনিং যাহি।

স (শঙ্খচূড়নাম্নখ্যাতঃ অসুরঃ) তুলসীমুবাহ দেবানামধিকারং জহর, দেবাঃ বক্ষসভাং গতাঃ, ব্রহ্ম তৈঃ সাৰ্দ্ধং শিবলোকং গতবান্ শিবস্তৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং গতবান্। নারায়ণো ব্রহ্মাণমুবাচ মম শূলং গৃহীত্বা শিবো যুদ্ধার্থং তত্র গচ্ছতু, অহঞ্চ শঙ্খচূড়ারূপেন তৎপত্ন্যাঃ সতীত্বভঙ্গং করিষ্যামীতি শ্রুত্বা, শিবস্তত্র জগাম, স শিবেন সহ যুদ্ধে নিযুক্তস্তদানীং নারায়ণস্তৎপত্নীং তদ্রূপেণ ধর্ষিতবান্, পশ্চাৎ সা নারায়ণং জ্ঞাত্বা, শশাপ, ত্বং পাষাণো ভব, জন্মান্তরে আত্মানং বিস্মরিষ্যসি, ইত্যুক্তাতচ্চরণে পপাত রুরোদ চ, তদা নারায়ণস্ত-মুবাচ ত্বমিদং শরীরং ত্যক্ত্বা রমাসদৃশী ভব, ময়া সহ ক্রীড়, ইয়ং তনুর্গণ্ডকী নদী ভবতু, তব কেশসমূহস্তুলসীনাম্না পুণ্যবৃক্ষো ভবতু তদা তৎসর্ব্বমভূৎ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তম্।

পদ্মপুরাণমতে জলন্ধরপত্নীবৃন্দালাবণ্যদর্শনেন বিষ্ণুর্মুগ্ধঃ তন্মোহবারার্থং দেবা মহদেব শরণঙ্গতাঃ। ইত্যাদি

তুলসীর উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণে দুই তিন প্রকার কথা লিখিত আছে, তন্মধ্যে এস্থলে আমি দুই প্রকার মত বর্ণন করিতেছি। যথা—গোলোকে তুলসী নাম্নী

গোপীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, রাধা অত্যন্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া, শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি মানবী হইয়া ধরাতলে জন্মগ্রহণ কর। তৎপরে তাহার শাপে তুলসী মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে, শঙ্খচূড় নামক অসুর উক্ত তুলসীকে বিবাহ করে। শঙ্খচূড় তপোবলে, দেবতাদিগের অধিকার কাড়িয়া লইলে, দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গিয়া আপনাদিগের দুঃখ জানাইলেন, ব্রহ্মা নিজে কিছু প্রতিকার করিতে না পারিয়া, সকলকে সঙ্গে লইয়া শিবধামে গমন করিলেন। শিবও নিরুপায় দেখিয়া, ব্রহ্মাদিকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তথায় বিষ্ণু সমস্ত অবগত হইয়া, বলিলেন যে, শিব আমার ত্রিশূল লইয়া শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করুন, আমি এই অবকাশে শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া, তুলসীর সতীত্ব নাশ করিব। একথা শুনিয়া শিব যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, ও চক্রী বিষ্ণু, শঙ্খচূড় রূপ ধারণ করিয়া, ছলনা পূর্ব্বক পরম পবিত্রা মহাসতী তুলসীর সতীত্ব নাশ করিলেন ; পরে তুলসী নারায়ণের দুষ্টত জ্ঞাত হইয়া যারপর নাই দুঃখিতা হইলেন ও পুরাণ কর্ত্তার নারায়ণকে অনেক ভর্ৎসনাদি করিয়া বলিলেন যে, তুমি যখন সাক্ষাৎ ভগবান হইয়া, এই পাপাচরণ করিলে, সেই পাপ জন্য তোমাকে জন্মান্তরে পাষাণ হইতে হইবে ও তুমি নিজস্বরূপ ভুলিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে ভগবানের চরণে পড়িয়া, ভয়ানক ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন নারায়ণ বলিলেন, তুমি এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া, রমা সদৃশী হও, এবং আমি গণ্ডকী শিলা অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা হইলে, তুমি পবিত্র তুলসী হইয়া আমাতে শোভা পাইবে ও আমার সহিত ক্রীড়া করিবে।

পুনশ্চ পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, জলন্দরের পত্নীর রূপলাবণ্য দেখিয়া বিষ্ণু মুগ্ধ হইয়া গেলেন ও অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে দেবতারা বিষ্ণুকে রক্ষা করিবার জন্য শিব সন্নিধানে গমন করিলেন। শিব বলিলেন তোমরা মায়াকে আরাধনা কর, দেবতারা মায়াকে আরাধনা করিলেন ইত্যাদি।

শিবের উৎপত্তিত্ত।

পুরা দারুবনে জাতং যদ্‌বৃত্তন্ত দ্বিজন্মনাম্।
তদেব শ্রুয়তাং সম্যক্ কথয়ামি যথাশ্রুতম্॥
দারু নাম বনং শ্রেষ্ঠং তত্রাসন্নৃষিসত্তমাঃ।
শিবভক্তাঃ সদা নিত্যং শিবধ্যান পরায়ণাঃ॥

ত্রিকালং শিবপূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তি স্ম নিরন্তরম্।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দেবং মন্ত্রৈর্বা ঋষিসত্তমাঃ॥
এবং সেবাং প্রকুর্ব্বন্তো ধ্যানমার্গপরায়ণাঃ।
তে কদাচিদ্বনে যাতাঃ সমিদাহরণায় চ॥
এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাচ্ছঙ্করো নীললোহিতঃ।
বিরূপঞ্চ সমাস্থায় পরীক্ষার্থং সমাগতঃ॥
দিগম্বরোঽতিতেজস্বী ভূতিভূষণভূষিতঃ।
চেষ্টাঞ্চৈব কটাক্ষঞ্চ হস্তে লিঙ্গঞ্চ ধারয়ন্॥
মনাংসে মোহয়ন্ স্ত্রীণামাজগাম হরঃ স্বয়ম্।
তং দৃষ্টা ঋষিপত্ন্যস্তাঃ পরং ত্রাসমুপাগতাঃ॥
বিহ্বলা বিস্মিতাশ্চৈব সমাজগ্মুস্তথা পুনঃ।
আলিলিঙ্গুস্তদা চান্যাঃ করং ধৃত্বা তথাপরাঃ॥
পরস্পরন্ত সংহর্ষাদ্‌গতশ্চৈব দ্বিজন্মনাম্।
এতস্মিন্নেব সময়ে ঋষিবর্য্যাঃ সমাগমন্॥
বিরুদ্ধং বৃত্তং দৃষ্টা দুঃখিতাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
তদা দুঃখমনুপ্রাপ্তাঃকোঽয়ং কোঽয়ং তথাঽব্রুবন্॥
যদা চ নোক্তবান্ কিঞ্চিৎ তদা তে পরমর্ষয়ঃ।
উচুস্তং পুরুষং তে বৈ বিরুদ্ধং ক্রিয়তে ত্বয়া॥
ত্বদীয়শ্চৈব লিঙ্গশ্চ পততাং পৃথিবীতলে।
ইত্যুক্তে তু তদাতৈস্ত লিঙ্গঞ্চ পতিতং ক্ষণাৎ॥ ইত্যাদি।

শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা অধ্যায় ৪২।

* * * *

তত্রাপি গত্বা মদনো দদর্শ বৃষকেতনং।
দৃষ্টা প্রহর্ত্তুকামোঽস্য ততঃ স প্রাত্রবঙ্করঃ॥
ততো দারুবনং ঘোরং মদনাভিসৃতো হরঃ।
বিবেশ ঋষয়ো যত্র সপত্নীকা ব্যবস্থিতাঃ॥
তে চাপি ঋষয়ঃ সর্ব্বে দৃষ্টা মূর্দ্ধাণ নতাভবন্।

ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ ভিক্ষাং মে প্রতিদীয়তাং॥
তং প্রবিষ্টং তদা দৃষ্টা ভার্গবাত্রেয় যোষিতঃ।
প্রক্ষোভমগমন্ সর্ব্বা হীনসত্ত্বাঃ সমন্ততঃ।
ঋতে ত্বরুন্ধতি মেনামনসূয়াঞ্চ ভাবিনীং।
এতাভ্যাং ভর্তৃপূজাসু কৃতং বৈ সুস্থিরং মনঃ॥
ততঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্ব্বা যত্র যাতি মহেশ্বরঃ।
তত্র প্রয়ান্তি কামার্ত্তা মদবিহ্বলিতেন্দ্রিয়াঃ॥
ত্যক্ত্বাশ্রমাণি শূন্যানি স্বানি তা মুনিযোষিতঃ।
অনুজগ্মুর্যথা মত্তং করিণ্য ইব কুঞ্জরং॥
ততস্তু ঋষয়ো দৃষ্টা ভার্গবাঙ্গিরসো মুনে।
ক্রোধান্বিতাব্রুবন্ সর্ব্বে লিঙ্গোঽস্য পততাং ভুবি॥
ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং বিদারয়েৎ।

ইত্যাদি বামুন পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়।

মতান্তরে।

তান্ বিলোক্য ততো দেবো নগ্নঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥
বনমালাকৃতাপীড়ো যুবা ভিক্ষাকপালভৃৎ।
আশ্রমে পর্য্যটন্ ভিক্ষাং মুনীনাং নিয়তাত্মনাং॥
দেহি ভিক্ষাং ততশ্চোক্ত্বা স ভ্রমন্নাশ্রমং যযৌ।
তং বিলোক্যাশ্রমগতং যোষিতা ব্রহ্মবাদিনাং॥
সকৌতুকস্বভাবেন সত্য রূপেণ মোহিতাঃ।
প্রোচুঃ পরস্পরমিতীবোক্ত্বা গৃহ্য মূলফলং বহু।
গৃহাণ ভিক্ষামুচুস্তাস্তং দেবং মুনিযোষিতঃ॥
তস্মৈ দত্ত্বৈব তাং ভিক্ষাং পপ্রচ্ছুস্তাঃ স্মরাতুরাঃ॥

নার্য্য উচুঃ।

কোঽসৌ নাম ব্রতবিধিস্ত্বয়া তাপস সেব্যতে।
যত্র নগ্নেন লিঙ্গেন বনামালা বিভূষিতঃ॥ ইত্যাদি।
ইত্যুক্ত্বা তাস্তদাতীব জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ।

কাচিচ্চকর্ষ বাহুভ্যাং কাচিৎ কামপরা তথা॥
জানুভ্যামপরা নাভ্যাং কচেষু ললনাপরা।
অপরা তু কটীবন্ধে চাপরা পাদয়োরপি॥
ক্ষোভং বিলোক্য মুনয় আশ্রমেষু সুযোষিতাং।
হন্যতামিতি সংভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ॥
পাতয়ন্তি চ দেবস্য লিঙ্গমুগ্রুধ্য ভীষণং।
পাতিতে তু ততো লিঙ্গে গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ॥ ইত্যাদি।

বামনপুরাণ ৪২ অধ্যায়

পুনঃ প্রকারান্তরে যথা—

ততো বিবাহং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতকৃত্যা যথাগতাঃ।
গতাঃ সর্ব্বে মহেশোঽপি সত্যা সহ তদাগৃহম্॥
জগাম রেমে সত্যা চ চিরং নির্ভর মানসঃ।
অথ কালে কদাচিত্তু সত্যা সহ মহেশ্বরঃ॥
রেমে ন শোকে তু সোঢুং সতী শ্রান্তাভবত্তদা।
উবাচ দীনয়া বাচা দেবদেবং জগদ্ গুরুং॥
ভগবন্নাহিশক্লোমি তব ভারং সুদুঃসহং।
ক্ষমস্ব মাং মহাদেব কৃপাং কুরু জগৎপতে॥
নিশম্য বচনং তস্যা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নির্ভরং রমণং চক্রে গাঢ়ং নির্দ্দয় মানসঃ॥
কৃত্বা সম্পূর্ণ রমণং সতীচ ত্যক্ত মৈথুনা।
উত্থানায় মনশ্চক্রে উভয়োস্তেজ উত্তমং॥
পপাত ধরণী পৃষ্ঠে তৈর্ব্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে শিবলিঙ্গাস্তদাভবন্॥
তেন ভূতা ভবিষ্যাশ্চ শিবলিঙ্গাঃ সযোন চঃ।
যত্র লিঙ্গং তত্র যোনির্যত্রযোনিস্ততঃ শিবঃ॥
উভয়োশ্চৈব তেজোভিঃ শিবলিঙ্গং ব্যজায়তঃ।

নারদ পঞ্চরাত্রে ৩ রাত্রং।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলির অর্থ এতদূর অশ্লীল যে, আমি ঐগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে কলঙ্কিত বা এই পুস্তকের কলেবরকে অপবিত্র করিতে চাহি না, প্রথমতঃ এরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করাই কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু আমায় এস্থলে অগত্যা বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে; কারণ আমাদের দেশের লোকের নীতি সম্প্রতি অত্যন্তই নীচ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তৎপরে উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলির বিষয় আর একটী দ্রষ্টব্য এই যে, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার উৎপত্তির বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থপর লেখকেরা, লোক ঠকাইবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে গুটিকত অত্যন্ত নবীন। তৎপরে সৃষ্টিক্রম বিষয়ে, এক পুরাণের সহিত অপর পুরাণের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং প্রত্যেকগুলিই বৈদিক সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ ভাবে লেখা আছে। শিবপুরাণে শিবের স্তুতিও বিশেষত্ব, ও অপরাপর দেবতা, শিব অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এরূপ লেখা আছে। বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বিষ্ণু পুরাণাদিতে, এইরূপে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব, ও অপরাপর দেবতার নিকৃষ্টত্ব বিষয় লিখিত আছে; এমন কি শিব আদিকে দাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপে গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর, এবং বিষ্ণু ও শিবপুরাণে শিবকে এবং দেবীপুরাণে দেবীকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া অপরাপর দেবতাকে নিকৃষ্ট ও দাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ কেহ এরূপ কুতর্ক করেন, যে যে পুরাণে যে দেবতার নামের শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাহাকেই পরমাত্মা বলিয়া ধরা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপর সকলকে নিকৃষ্ট ও দাস বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে; ইহাতেই পুরাণ কর্ত্তা যে একজন নহেন ও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের দেবতা যে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা বেশ প্রমাণিত হয়। পুরাণ কর্ত্তারা কেবল আপন ইষ্টকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা পরস্পরের সহিত দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই, দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে দুই একটি পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃতি করিতেছি যথা;—

বিষ্ণু দর্শন মাত্রেণ শিবদ্রোহ প্রজায়তে।
শিবদ্রোহাৎ ন সন্দেহো নরকং যান্তি দারুণং॥

এরূপ শোক পুরাণে ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায়, পরন্তু অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক উপর্যুক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, পুরাণের একজন কর্ত্তা নহেন, অতএব ব্যাসদেব কখনই

পুরাণ প্রণয়ন করেন নাই। অধিক আর কি লিখিব, স্কন্দ পুরাণ, যাহা বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতেই ভাগবত পুরাণের ভয়ানক বিরুদ্ধে লেখা আছে, যাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, যে, এই দুই গ্রন্থ একজন কর্ত্তৃক কখনই রচিত নহে। উদাহরণ স্বরূপ স্কন্দ পুরাণের কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানা দৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদু॥
কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

যে শাস্ত্রে দৈত্যগণের বধ, তথা ভগবতী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, সেই শাস্ত্রকেই যথার্থ ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে কোন কোন দুরাত্মা বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্তেরা ভাগবৎ গ্রন্থকে যথার্থ ভাগবত না বলিয়া, অন্য গ্রন্থকে ভাগবত কল্পনা করিবেক। এখন যদি স্কন্দ পুরাণকে বিশ্বাস করা যায়, তবে ভাগবত গ্রন্থ ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে, কারণ যদি স্কন্দ পুরাণকে ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ভাগবত পুরাণ যে ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে, তাহা সিদ্ধ হয়। আমি ইতিপূর্ব্বে স্কন্দ পুরাণ ও ভাগবত উভয় গ্রন্থই ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত নহে, তাহা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছি। অতএব পুরাণাদি যে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

এইরূপে বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে লিখিত আছে যথা—

যথা শ্মশানজংকাষ্ঠং সর্ব্বকর্ম্মসুগর্হিতম্।
তথা চক্রাঙ্কিতোবিপ্রঃ সর্ব্বকর্ম্মসুগর্হিতঃ॥
যস্যাস্তুগুশংখাদি লিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ
স সর্ব্বযাতনাভোগী চাণ্ডালঃকোটিজন্মসু॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
ব্রাহ্মণোযদিমোহেন তাপয়েদ্বহ্নিমুদ্রয়া।
ন কর্ম্মার্হোভবেদত্র সবৈপাষণ্ডসংজ্ঞকঃ॥ বায়ুপুরাণ।
পূর্ব্বজন্মাতনুর্দগ্ধা শঙ্খচক্রাদিভিঃপৃথক্।
ন তস্যানিষ্কৃতির্দৃষ্টা স্নানদানজপাদিভিঃ॥ অগ্নি পুরাণ
তপ্তমুদ্রাদগ্ধদেহ স্তপ্তশূলাঙ্কিতস্তথা।
হরিবাসভোজীচ কুম্ভিপাকংব্রজেদ্বিজঃ॥ দেবী ভাগবত।

অর্থাৎ শ্মশানের দগ্ধ কাষ্ঠ যেরূপ কোন শুভ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তদ্রূপ শঙ্খচক্রাদি দ্বারা দগ্ধীভূত ব্রাহ্মণ কোন শুভকর্ম্ম করিবার বা করাইবার উপযুক্ত থাকেন না। অধিক কি, যে জন শঙ্খচক্রাদি দ্বারা স্বীয় শরীর অঙ্কিত করেন, তাহাকে কোটি জন্ম পর্য্যন্ত চণ্ডাল হইতে হয়।

যদি কোন ব্রাহ্মণ ভ্রম বশতঃও শঙ্খচক্র দ্বারা স্বীয় শরীর অঙ্কিত করেন তথাপি তাহাকে পাষণ্ড বলিয়া জানিবে ও তিনি সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত।

যে ব্রাহ্মণ শঙ্খ চক্রাদি দ্বারা স্বীয় দেহ অঙ্কিত করেন, তিনি স্নান দান জপাদি কোন শুভকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইতে সমর্থ হন না।

শঙ্খচক্রাদি ধনুর্ব্বান বা ত্রিশূলাদি দ্বারা অঙ্কিত দেহ বা একাদশীতে ভোজনকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুম্ভীপাকরূপ নরকে গমন করেন ইত্যাদি।

এখন কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ভাল না হয় ব্যাসদেব পুরাণ প্রণয়ন করেন নাই, পরন্তু যখন শাস্ত্রে পুরাণ শব্দ পাওয়া যায়, যথা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, তখন সেই পুরাণ কি বা কাহাকে বলে ?

ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ। মহাভারত।
পুরাণানাখিলানি চ॥ মনু॥
ইতিহাস পুরাণঃ পঞ্চমোবেদানাং বেদঃ। ছান্দোগ্য।
দশমেহহনি কিঞ্চিৎ পুরাণ মাচক্ষীত পুরাণ বিদ্যা বেদঃ—ইত্যাদি।

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ বেদার্থানুকূল হইয়া থাকে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তির পর, দশম দিবসে পুরাণ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া জানিবে। পুরাণ বিদ্যার দ্বারা বেদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, এজন্য ইহা বেদ স্বরূপ ইত্যাদি।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এস্থলে পুরাণ শব্দে, আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি নবীন পুরাণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু পুরাণের প্রকৃত অর্থ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়, যথা—

"ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান গাথানারাশংসীরিতি"

অর্থাৎ ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ গ্রন্থেরই, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্য জনক মৈত্রেয়ী আদির সংবাদ লেখা আছে, এজন্য ইহাকে পুরাণ বলে, এবং জগদুৎপত্তির বিষয় বর্ণন থাকা প্রযুক্ত ইহাকে পুরাণ বলা যায়। বেদ শব্দার্থ

বর্ণন করা হেতু, ইহাকে কল্প বলা যায়। ইহাতে কোন স্থানের দৃষ্টান্তকে, দার্ষ্টান্ত রূপে বর্ণন করা হেতু, ইহাকে নারাশংসী বলা যায়। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে মানবের সদসৎ কর্ম্মের ও জীবনের বর্ণনা আছে, ইহা দ্বারা বেদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং ইহার দ্বারা পিতৃকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানী মহাত্মা ও আপ্তদিগের প্রশংসা জ্ঞাত হওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রাদিতে অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে দশম দিবসে এইরূপ পুরাণের কথা শুনিবার আদেশ আছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, গৃহ্যসূত্রাদিতে যজ্ঞান্তে পুরাণ শ্রবণ করিবারা আজ্ঞা ব্যাসদেবের জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, প্রদান করা হইয়াছে, অতএব তথায় অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করিবার প্রথা বা আজ্ঞা হইতে পারে না। অনেকে অজ্ঞান বশতঃ, ও নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, পুরাণ অনাদি কাল হইতে আছে, এবং প্রতি কল্পে বেদের ন্যায় ইহা প্রকাশিত হয়। একথা সত্য হইতে পারে না, কারণ পুরাণ ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান নহে, ইহা মনুষ্য প্রণীত; তৎপরে ইহা গৃহ্যসূত্রাদির পরে লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ পুরাণ যে গৃহ্যসূত্রাদি হইতে নবীন ইহা পৌরাণিক মহাশয়েরাও স্বীকার করেন। তৎপরে পুরাণ কর্ত্তারাই স্বয়ং স্বীকার করেন যে, যেস্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্টি হয়, তথায় বেদ সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, যেখানে বেদ ও স্মৃতিতে অনৈক্য হইলে পুরাণ পরিত্যাজ্য।*

আমি ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি যে, সৃষ্টিক্রম বিষয় এক পুরাণের সহিত অনেক সময় অপর পুরাণের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং প্রায় প্রত্যেকগুলিই পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং বেদানুযায়ী সৃষ্টিক্রমের বিপরীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে ২/৪টী বর্ণন করিতেছি যথা—

শিবপুরাণে লিখিত আছে যে, শিবের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, এবং তিনি এক নারায়ণ জলাশয় উৎপন্ন করিলেন, ও তাঁহার নাভী হইতে কমল, ও কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, যে সর্ব্বত্রই জলময়, তিনি তখন এক অঞ্জুলী জল লইয়া জলে প্রক্ষেপ করিলেন, তাহাতে বুদ্বুদ উৎপন্ন হইল, 'ঐ বুদ্বুদ্ হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন

---

* শ্রুতি স্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রেতং প্রমানন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ ব্যাস সংহিতা।

হে পুত্র? সৃষ্টি উৎপন্ন কর। ইহাতে ব্রহ্মা মহাক্রোধে বলিলেন, রে দুরাত্মন্! আমি পুত্র, না তুই পুত্র? এই কথায় দুই জনে বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দুইজন জলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেবের চৈতন্য হইল, তিনি দেখিলেন যে সৃষ্টি উৎপত্তি জন্য যে দুই জনকে তিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা সৃষ্টি উৎপন্ন না করিয়া, বিবাদ করিতেছে, এজন্য তিনি এক তেজময় লিঙ্গ উৎপন্ন করিলেন, লিঙ্গ আকাশে উঠিয়া গেল। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুই জনেই লিঙ্গ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, এবং বলিলেন যে, এই লিঙ্গের অন্ত লওয়া উচিত। তখন দুই জনের মধ্যে এইরূপ নিরূপিত হইল যে, যেজন প্রথমে এই লিঙ্গের অন্ত লইতে পারিবেন, তিনিই পিতা ও অপরে পুত্র হইবেন। এই কথায় ব্রহ্মা হংসের শরীর ধারণ করিয়া লিঙ্গের উপর দিয়া, ও বিষ্ণু কূর্ম্ম শরীর ধারণ করিয়া লিঙ্গের নিম্ন দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে দুইজনেই দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াও, কিছুই অন্ত পাইলেন না; এমন সময় একটী গাভী ও একটা কেতকীপুষ্পের বৃক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি কোথা হইতে আগমন করিতেছ? ব্রহ্মা বলিলেন যে, আমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াও, এই লিঙ্গের অন্ত কোথায় তাহা জানিতে পারিলাম না। তৎপরে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরাও কি এই লিঙ্গের অন্ত পাও নাই? তাহাতে তাহারা বলল, না। এককথায় ব্রহ্মা বলিলেন তোমাদিগকে আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, ইহার অন্ত পাওয়া গিয়াছে, এবং তোমাদিগের মধ্যে গাভীটা ইহার মস্তকে ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে, ও তুমি কেতকী তোমার পুষ্প ইহার মস্তকে দিয়া পূজা করা হইয়াছে। প্রথমে গাভী ও কেতকী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন; তখন ব্রহ্মা ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, যদি তোমরা আমার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান না কর, তবে তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিব। একথায় তাহারা ভীত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। এবং তখন তিন জনে বিষ্ণুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে বিষ্ণু! তুমি কি এই লিঙ্গের অন্ত পাইয়াছ? বিষ্ণু বলিলেন না, তৎপরে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি অন্ত পাইয়াছেন? ব্রহ্মা বলিলেন হ্যাঁ, তখন বিষ্ণু বলিলেন তোমার সাক্ষ্য কে? তখন ব্রহ্মা বলিলেন ইঁহারা

(অর্থাৎ গাভী ও বৃক্ষ) বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্রহ্মার কথা কি সত্য? তখন গাভী ও বৃক্ষ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল। ইহাতে লিঙ্গ হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে দৈববানী হইল যে, রে দুরাত্মাগণ! কিজন্য তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে? অতএব এই পাপের জন্য, অদ্য হইতে হে কেতকী বৃক্ষ! তোমার পুষ্প দ্বারা কোন দেবতার পূজা হইবে না; যদি কেহ পূজা করে, তাহার সর্বনাশ হইবে। ও তুমি গাভী! যে মুখে এই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছ, তোমার সেই মুখ অত্যন্ত অপবিত্র হইবে; অর্থাৎ তুমি এই মুখ দ্বারা বিষ্ঠা ভক্ষণ করিবে; তবে তোমার পশ্চাৎ ভাগের লোকে পূজা করিবে; অর্থাৎ তোমার পুরীশের পূজা হইবে, পরন্তু মুখের পূজা কেহই করিবে না। তৎপরে বিষ্ণুকে বর প্রদান করিলেন যে, তুমি সত্যবাদী, এজন্য তোমার সর্ব্বত্র পূজা হইবে, এবং ব্রহ্মা মিথ্যাবাদী, এজন্য তাহার কুত্রাপি পূজা হইবে না। তৎপরে দুইজনেই, অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উক্ত লিঙ্গের পূজা করিলেন; ইহাতে শিব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমাদিগকে আমি সৃষ্টি করিতে পাঠাইলাম, তোমরা কিজন্য বিবাদ করিতেছিলে? তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন যে, সৃষ্টির উপাদান সামগ্রী কোথায়? আমরা কি দিয়া সৃষ্টি করিব? একথা শুনিয়া শিব নিজ জটা হইতে একটা ভস্মের গোলক প্রদান করিলেন, এবং তাহা লইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি সমাপ্ত করিলেন। এখন বক্তব্য এই যে, সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার শরীর কোন্ উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়াছিল? অর্থাৎ যদি সে সময় পঞ্চতত্ত্বাদি কিছুই ছিল না, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গাভী ও কেতকীর শরীর কি দ্রব্যের পরমাণু বা কোন্ প্রকৃতির গুণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল? তৎপরে যদি সে সময় সৃষ্টিই হয় নাই তবে কোথা হইতে গাভী ও কেতকী পুষ্প উৎপন্ন হইল? আরও দেখুন মহাদেব দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিবাদ হইতে ছিল, তাহা আদৌ জানিতে পারেন নাই; বোধ করি সে সময় সিদ্ধির নেশার ঝোঁকে বাবাজীর মেজাজ বেঠিক ছিল, এজন্য সহস্র বৎসর পরে তাহার চৈতন্য হইল যে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সৃষ্টি না করিয়া, বিবাদ করিতেছেন। পুনশ্চঃ—এস্থানে শিব লিঙ্গের উৎপত্তি বিষয় আর এক প্রকার কথিত হইল। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পুরাণকর্ত্তারা যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন।

ভাগবতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে স্বায়ংভাব, এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে সত্যরূপা রাণী,

ললাট হইতে রুদ্র ও মরীচি আদি দশ পুত্র, যাহা হইতে দশ প্রজাপতি, এই প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যাকে কশ্যপের সহিত বিবাহ দেওয়া যায়। এই কশ্যপ হইতে দেব, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পশু, পক্ষী আদি সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, মনুষ্য হইতে পশু পক্ষী আদির উৎপত্তি, কেবল পুরাণ কর্ত্তারাই স্বীকার করিতে পারেন, কারণ তাহাদিগের বুদ্ধি অনেক সময় পশু অপেক্ষা অধিক ছিল না, যাহা ইচ্ছা তাহাই তাহারা লেখনী দ্বারা, প্রকাশিত করিয়াছেন। এস্থানে অনেকেই এরূপ শঙ্কা করেন যে, পশু পক্ষী আদি কশ্যপ দ্বারায় সৃষ্ট বা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহা কিরূপে সৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইবে? এস্থলে বক্তব্য এই যে পৌরাণিক মহাশয়ের কশ্যপ শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া, বা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া, নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী মত বর্ণন করিয়াছেন। কশ্যপের প্রকৃত অর্থ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও নিরুক্ত আদিতে লিখিত আছে।

তস্মাৎ কাশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ। শত ৭।৫।১৫

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি॥ নিরুক্ত কং ২। অং ২

ইহার অর্থ এই যে কশ্যপ কর্ত্তৃক সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বরকে কশ্যপ বলে, কারণ পশ্যক শব্দ "পশ্যতীতি পশ্যঃ পশ্য এব পশ্যকঃ" দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি ভ্রান্তি রহিত হইয়া, চরাচর জগৎ, জীব ও সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরীক্ষণ করেন, এবং "আদ্যন্ত বিপর্য্যয়াচ" এই মহাভাষ্যের বচন দ্বারা আদির অক্ষর অন্তে ও অন্তের অক্ষর আদিতে আসিয়া পশ্যকের স্থানে কশ্যপ হইয়া যায়। অতএব কশ্যপ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়, এই প্রকৃত অর্থ না জানিয়া, অথবা যদিচ্ছা পূর্ব্বক ইহা গোপন করিয়া, পুরাণ কর্ত্তারা বৈদিক সৃষ্টি ক্রমের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন।

দেবীপুরাণে লেখা আছে যে দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনকে সৃষ্ট করিলেন; তৎপরে তিন জনেই তপস্যা করিতে লাগিলেন। দেবী ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, তুমি আমাকে বিবাহ কর। ব্রহ্মা অস্বীকার করিলেন ও এক এক দিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন, দেবীও সেই সেই দিকে আসিয়া কামার্ত্ত হইয়া পতি হইতে অনুরোধ করিলেন। পরে দেবী ব্রহ্মাকে ছাড়িয়া বিষ্ণুর নিকট গিয়া, তাহাকে পতি হইতে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, মাতঃ! আপনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, আমি আপনার পুত্র আমাকে এরূপ অসঙ্গত কার্য্য

করিতে অনুরোধ করিবেন না। তৎপরে তিনি শিবের নিকট গিয়া তাহাকে পতি হইতে প্রার্থনা করিলেন। শিব তাহাকে স্বীকার করিলেন, ইত্যাদি। এখন আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এ কি ভয়ানক ব্যাপার! ও এরূপ পুরাণ কর্ত্তারাই বা কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যদি তাহাই না হইবে, তবে দেবী ভক্তেরাই বা কেন না এরূপ লিখিবেন, যথা, নিম্নে লিখিত হইতেছে। যখন দেবীপুরাণকর্ত্তারা সৃষ্টিক্রম বিষয়, এরূপ ভয়ানক ভাবে লিখিয়াছেন, তখন তাহারা যে আপনাদিগের সাধন প্রণালীকে একবারে ভয়ানক নীতি ও বেদ বিরুদ্ধ রূপে বর্ণন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এরূপ লোকেরা, "মাতৃ যোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্ব যোনিষু" ইত্যাদি, ভয়ানক বেদবাহ্য ধর্ম্ম, ও সমাজ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া, আপনাদিগকে বীর ও "ত্রিসন্ধ্যা স্নান মৌনাদি হবিষ্যাসী জিতেন্দ্রিয়।" "এবং যঃ ক্রিয়তেকর্ম্ম পশুভাব স উচ্যতে।" অর্থাৎ যিনি তিনকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, যিনি প্রতিদিন স্নানাদি করিয়া মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকেন, যিনি ঘৃতান্ন ও নিরামিষ ভোজন অর্থাৎ পশু ইত্যাদি হিংসা তথা মদ্য মাংসাদি সেবন করেন না, এবং যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, অর্থাৎ যিনি গৃহস্থ হইয়াও কেবল পুত্রোৎপাদন জন্য ঋতু কালে ধর্ম্ম পত্নীতে গমন করেন ও অপর স্ত্রী মাত্রকে মাতৃবৎ জ্ঞান করেন, তিনি পশু; এরূপ মত প্রচার করিতে বীর মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ বীর নামধারী মহাপাপী ও দুরাচারী বীরপন্থী মহাশয়েরা "মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য ইত্যাদি বলিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, পরন্তু ইহাদিগের মধ্যে মাতঙ্গী বিদ্যাবলম্বী মহাশয়েরা পাপের মাত্রার পরাকাষ্ঠায় উঠিয়া "মাতরপি ন ত্যজেৎ" ইত্যাদি সর্ব্বোপরি ভয়ানক এবং (most revolting to human idea) ও যতদূর নীচ ও নীতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, ও যাহা মনে মনে বিচার করিলেও মন অস্থির ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়, তাহাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই বীরাচারী মহাশয়দিগের ধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম সাধন প্রণালী, সমস্তই নীতি ও বেদ বিরুদ্ধ। আমি এস্থলে তাহাদিগের মত বিস্তারিত প্রচার করিতে ও তদ্বিষয় পূর্ণরূপে বিচার করিতে চাহি না। কারণ তাহা হইলে এই পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যাইবেক। এ বিষয়ের বিচার আমি বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্র মত খণ্ডনে প্রকাশ করিয়াছি, যাহার ইচ্ছা হইবে তিনি উক্ত পুস্তক পাঠ করিতে পারেন; যাহা হউক আমি এস্থলে কেবল মাত্র গুটীকত উদাহরণ

স্বরূপ উদ্ধৃত করিব, যাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে বীরাচারী তান্ত্রিক মহাশয়েরা কিরূপ স্বভাবের লোক ও তাহাদের সাধন ও ধর্ম্ম প্রণালী, কতদূর সৃষ্টিক্রম বা বেদ, নীতি ও সমাজ বিরুদ্ধ ; উদাহরণ স্বরূপ যথা—

"পাশ বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদা শিবঃ।"
হলাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে, সুপ্তো নিশায়াং
গণিকা গৃহেষু, বিরাজতে কৌলব চক্রবর্ত্তী।
"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।"
"পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"
"অহং ভৈরবস্ত্বং ভৈরবী হ্যাবয়োরস্তু সঙ্গম॥"
রজঃস্বলা পুষ্করং তীর্থং, চাণ্ডালিতু স্বয়ং কাশী,
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।
অযোধ্যা পুক্কসী প্রোক্তা। ইত্যাদি।
মদ্যং মাংস চ মীনঞ্চ মুদ্রা মৈথুন মেবচ
এতে পঞ্চ মকারাস্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে। ইত্যাদি।

উপর্য্যুক্ত উদাহরণের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—যে লোকে যাবৎ লোকলজ্জা, কুললজ্জা ও দেশ লজ্জাদি পাশ রূপে বদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ যাবৎ সে একবারে নির্লজ্জ ও বেহায়া না হইবে, তাবৎ সে পাশ বদ্ধ জীব ; এবং যখন সে লজ্জার মাথা খাইয়া নির্লজ্জ ও বেহায়া হইয়া সকলের সমক্ষ্যে যদিচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ যাবৎ তাহার অন্তরাত্মার প্রেরণা থাকিবে যে, এ কর্ম্ম করা ভাল অথবা এরূপ অধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে, তাবৎ সে পশু রূপে গণ্য হইবে ; এবং যখন তাহার হিতাহিত বিবেচনা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবেক, ও কোনরূপ পাপাচরণ করিতে, যখন তাহার মনে সামান্য মাত্রও উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইবে না, তখনই সে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে যিনি শুণ্ডিকালয়ে গিয়া ক্রমাগতঃ সুরা পান করেন ও তৎপরে বেশ্যালয়ে গমন করিয়া তথায় রাত্রি অতিবাহিত করেন ও অন্যান্য (পাপাচারে) প্রবৃত্ত হন, তিনি কৌল অর্থাৎ বীরাচারীদিগের মধ্যে চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে বীরাচারী মহাশয়, মদ্যপান করিতে করিতে নেশায় অভিভূত হইয়া, অচেতন

অবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন ও তৎপরে পুনরায় উঠিয়াই আবার মদ্যপানে রত হন, তাহার আর জন্ম হয় না।

ভৈরবী চক্রকালে * যিনি ভগ্নি আদি স্বজন বর্গের সহিতও ব্যভিচারে কুণ্ঠিত না হইয়া, আমি ভৈরব আর তুমি ভৈরবী এই মন্ত্র বলিয়া ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই মহান্ সাধক।

রজঃস্বলা স্ত্রী গমন করা, যাহা একেবারেই সৎ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, যিনি ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি পুষ্কর তীর্থ গমনের ফললাভী হইয়া থাকেন। এইরূপে যিনি চাণ্ডালী গমন করেন তিনি কাশী, যিনি চর্ম্মকারী গমন করেন তিনি প্রয়াগ, যিনি রজকী গমন করেন তিনি মথুরা, যিনি পুক্কসী গমন করেন তিনি অযোধ্যা গমনের পুণ্য প্রাপ্ত হন ; ইত্যাদি জানিবে।

---

*ভৈরবী চক্র এতদূর অশ্লীল যে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিয়া আমি এই পুস্তককে অপবিত্র করিতে পারি না, ও তাহা সভ্য জগতে প্রকাশ করা ভদ্রতা ও নীতি বিরুদ্ধ। আমাকে কুরীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য এই সমস্ত পুস্তক লিখিতে হইয়াছে, এজন্যই অগত্যা বাধ্য হইয়া সামান্যরূপে ইঙ্গিত দ্বারা ইহা বর্ণন করিতেছি। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তান্ত্রিক স্ত্রী ও পুরুষেরা, চক্রাকারে বসিয়া, মধ্যে কোন এক কৌল চক্রবর্ত্তী পাশমুক্ত বেহায়া বীরাচারী মহাশয়কে উলঙ্গ বসাইয়া তাহার "গুপ্তাঙ্গে" কোন এক সুন্দরী যুবতী বিবস্ত্রা, হইয়া, সিন্দুর, ফল, পুষ্প দুর্ব্বা আদির দ্বারা পূজা করিবেন। এই সচেতন অঙ্গকে বীরেরা জীবন্ত শিবলিঙ্গ বলিয়া থাকেন। তৎপরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সুরা দেওয়া যায়, তিনি তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেন, এবং এই উচ্ছিষ্ট সুরা চক্রের সকলে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। মদ্য অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণে দেওয়া যায়, ও তান্ত্রিক মহাশয়েরা ইহাকেই কারবারি বা আনন্দময় স্বরূপে বর্ণন করেন। স্ত্রীলোকের পূজা সমাপ্ত হইলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্ত্রীলোককে মধ্যে বিবস্ত্রা বসাইয়া তাহার অঙ্গের (যাহাকে তান্ত্রিকেরা যোনিপীঠ বলেন) পূজা করিয়া থাকেন, এবং তাহাকে সুরা আদি অর্পণ করিয়া, সেই সুরার প্রসাদ লন। এরূপ যুবতী কন্যা প্রায়ই নীচ জাতীয় লওয়া হয়, যথা চাণ্ডালী, চর্ম্মকারী, পুক্কসী আদি ; কারণ ভদ্র লোকের ঘরের কন্যারা শীঘ্র এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। তৎপরে যখন সকলে নেশায় অভিভূত হন, তখন দ্বীপ নির্ব্বাণ করা হয়। তৎপরে যে কি প্রণালীর পূজা হয়, তাহা আর আমি বর্ণনা করিতে সক্ষম নহি। দুই চারিজন বন্ধু, নিজ চক্ষে ভৈরবী চক্র দেখিয়া আসিয়া যাহা আমার নিকট বর্ণন করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও আমি বর্ণন করিলাম না।

যে জন মদ্য, মাংস, মীন, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ মকারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই মুক্তির অধিকারী। এবং এরূপ কর্ম্মই যুগে যুগে লোককে মুক্তি প্রদান করে। ইত্যাদি অপর নীতি, সমাজ ও বেদ বিরুদ্ধ মিথ্যা ও কল্পিত মত প্রচার করিতে দেবীভক্ত মহাশয়েরা কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক আমি পুনরায় পুরাণের বিষয় বর্ণন করিতেছি।

আধুনিক অনেক হিন্দুরা, বিশেষতঃ আর্য্যসমাজের বিরোধী হিন্দুরা প্রায়ই আর্য্যসমাজকে দোষারোপ করেন, যে আর্য্য-সমাজীরা হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী ও নিন্দাকারী,—বস্তুতঃ, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণবাদির মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব বা ভেদাভেদ নাই। এরূপ মিথ্যা দোষারোপ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। কারণ একত্রে বহুদিবস থাকিলে ও পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্রমে মিত্রতা লাভ হইলে, বহুকালগত বৈরীভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়া থাকে। এজন্য যদিচ পঞ্চোপাসকের প্রবৃত্ত কর্ত্তারা, পরস্পর পরস্পরের সহিত বিরোধ ভাব দেখাইতে ক্রটী করেন নাই, পরন্তু কালক্রমে যখন একজাতীয় উপাসকের সহিত অপর জাতীয় উপাসকের বিবাহাদি রূপ সম্বন্ধ চলিতে লাগিল, তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের বৈরীভাব কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইতে লাগিল ও তৎসঙ্গে এক শ্রেণীর উপাসকের দেবতাকেও অন্যে মানিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এস্থানে এবিষয়ে সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রদান করিতেছি, অপর দেশের প্রমাণ দিতে চাহি না। এই আর্য্যাবর্ত্ত ভূমিরই প্রমাণ দিতেছি। যথা—

পূর্ব্বকালে হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যে অত্যন্ত দ্বেষভাব বিদ্যমান ছিল, অধিক আর কি লিখিব, আধুনিক নবীন শাস্ত্রকারেরা "হস্তিনা তাড্য মহেনাঽপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরং" ইত্যাদি লিখিতে ক্রটী করেন নাই; পরন্তু কালক্রমে যখন বৈষ্ণব মতাবলম্বী ও জৈন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরস্পরের বিবাহ হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই বৈষ্ণব ও জৈনদিগের বিরোধ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল ও যে সকল জৈনেরা ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতেন, কালক্রমে তাহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ যাহাদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিবাহাদি সম্পন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে পুনরায় প্রণাম ও হিন্দু দেবতাদিগের পূজাদি দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন সকল জাতিই হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি করিতেন। অধিক আর কি লিখিব,

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে কিরূপ ভাব বিদ্যমান ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; পরন্তু কালক্রমে পরস্পর একত্র থাকিতে থাকিতে, কথঞ্চিৎ মনের বৈরীভাব দূরীভূত হইল, তখন হিন্দুরা মুসলমানের পীরের পূজা দিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, হিন্দুদিগের প্রধান দেবতা বিষ্ণুকে, সত্যপীর স্বরূপে বর্ণন করিতেও ক্রটী করিলেন না; ও তাহার জন্য পূজার নৈবেদ্য না করিয়া, এমন কি সিন্নী পর্য্যন্ত দিতে আরম্ভ করিলেন। এখন পর্য্যন্তও ঐ সত্যপীরের পূজা চারি বর্ণেই করিয়া থাকেন। সমগ্র ভারতবর্ষে অনেক হিন্দুরা হাসেন হোসেনের মানত করিয়া থাকেন, এমন কি তাহারা তাজিয়া পর্য্যন্ত বাহির করেন। এইরূপে অনেক মুসলমানও, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাত, কালী ও দুর্গার মানত ও এই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা ও ইহাদিগকে ছাগাদি বলি দিয়া থাকেন।

দেখুন পঞ্জাব দেশে বাবা নানক ও অপরাপর শিখ্ গুরুরা সকলেই মূর্ত্তিপূজার ভয়ানক বিরোধী ছিলেন; পরন্তু তাহাদিগের বংশধর ও মতাবলম্বীরা প্রায় সকলেই, এক্ষণে হিন্দুর দেব দেবীর পূজা করেন, এমন কি, এ বৎসর মহামণ্ডলের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, যদিচ শিখ্দিগের সহিত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয় কোন কোন স্থানে অনৈক্য আছে, তথাপি তাহাদিগকে হিন্দু সংজ্ঞার মধ্যে পরিগণিত করা উচিত ইত্যাদি।

আমি এস্থলে শিখ্গ্রন্থ হইতে গুটিকত শব্দ (শিখ্ গ্রন্থের বচনকে শব্দ বলে) উদাহরণ স্বরূপ বর্ণন করিতেছি যথা—

পাষাণ ঘড়কে মূর্ত্তি কিনি দেকর ছাঁতি পাঁ।
যে মূর্ত্তি সাঁচি হৈ তো ঘড়নহারকো খাঁয়॥
ভাত পহেত ওর লাপসী করকরা কসার।
ভোজন হারে ভোগীয়া ইস মূর্ত্তি মুখ ছার॥
জো পাথর কো কহতে দেও, তিসকী বৃথা হোবে সেও
জো পাথরকে পাঁয়ে পাঁয়, তাকী ঘাল অজত্থা যায়॥
অন্তর দেও ন জানে অন্ধ, ভরমকা মোহ পাওবে ফন্দ।
ন পাথর বোলে ন কুছ দে, ফোকট কর্ম্ম নিস্ফল হৈ সে॥
জো পাথরকো চন্দর চড়াবে, উস্‌সে কহো কৌন ফল পাওবে।

জো পাতরকী বিষ্ঠা খাহি রুলাই, তা পাথরকা ক্যা ঘট যাই। ইত্যাদি।
বুদ পূজ পূজ হিন্দুমুয়ে তুর্ক মুয়ে শির নাই,
ওয়াজে জারেঁ ওয়ানে গারে তেরী গত দৌউ নপাই।
জীয়ৎ পিতরকে ন মানে কোই মুয়ে শ্রাদ্ধকরাহি
পিতারভী বপুরে কহো কোঁ পাওয়েঁ কাউয়া কুত্তা খাই।
মাটীকে ঘড় দেবী দেবা তিন্ আগে জীব দেহী
এঁসে পিতর তুমহারে কহিয়ে আপন কাহে ন লেহী।
সরজীব কাটে নিরজীব পূজে অন্তকালকী ভারি
রামনাম কী গতি নাহি জানে ওরা ডুবে সংসারী।
দেবী দেবা পূজত ডোলে পারব্রহ্ম নহী জানা। ইত্যাদি।
কাহুকে পাহন পূজা ধরো শির, কাহুনে লিঙ্গ গলে লটকাও।
কাহুনকো হরি প্রাচীনিশা মহি, কাহূ পছাইকো শিস্ নিবাও।
কোউবুতান কো পূজত হৈ পশু, কৌ মৃতান কো পূজন ধাউ।
কূড় ক্রিয়া উরঝো সব হি জগ, শ্রীভগবান কী ভেদ ন পায়ো। কাহিকো পা
পূজত হৈ পশু, পাহন তো পরমেশ্বর নাহি। ওয়াহিকে পূজ প্রভু করকে, জিহি পূজন
অঘ ওঘ মিটাই ইত্যাদি। গ্রন্থ সাহেব।

উপর্য্যুক্ত বচনের তাৎপর্য্য এই যে লোকে পাষাণ দ্বারা কালী মূর্ত্তি প্রস্তু
করিয়া; শিবের ঘাড়ে পা দেওয়াইয়া দিয়াছে। যদি কালী মূর্ত্তি বাস্তবিক সত
দেবী
হইত; তবে উহা মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারককেই খাইয়া ফেলিত।

দেব দেবীকে যে অন্নাদি রুটী ও পায়সাদির ভোগ দেওয়া যায়; তাহা ঠাকুর
খায় না; পূজারি ও অপর ভোজনকারীরাই খাইয়া থাকে; মূর্ত্তির মুখে ছাই।

যে পাথরকে দেবতা বল; তাহার সেবা বৃথা হইয়া থাকে। যে পাথরে
মূর্ত্তির পদতলে তুমি প্রণাম কর; তোমার তাহাতে কোন ফল হয় না। মোহ
লোকেরা অনাত্মরূপ দেবতাকে না জানিয়া মোহরূপ ভ্রমজালে বদ্ধ হয়। পাথ
অর্থাৎ মূর্ত্তি কিছু বলেও না; বা কাহাকে কিছু দেয় না; এজন্য তাহার সে
করা নিষ্ফল জানিবে। পাথরের গায়ে চন্দন বা বিষ্ঠা লেপন কর; তাহা
তাহার কিছুই আসে যায় না; অর্থাৎ পাথর জড়, সে কি বুঝিবে যে; তাহ
গাত্রে কে কি লেপন করিল।

মূর্ত্তি পূজা করিয়া হিন্দুগণ মরিল, এইরূপে তুর্ক অর্থাৎ মুসলমানেরাও মূর্ত্তি বা পীরের সম্মুখে মস্তকাবনত করে। মৃতদেহকে হিন্দুরা দগ্ধ করে ও মোসলমানেরা কবরে দেয়, পরন্তু কেহই ঈশ্বরের মহিমা বুঝে না।

পিতা মাতাকে জীবিতাবস্থায় সম্মান বা সেবা না করিয়া, মরিয়া গেলে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ শ্রাদ্ধদ্রব্য কোথা হইতে পাইবেন ? পিণ্ডাদি কাক ও কুকুরে আহার করে, ইহাই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবী ও দেবতা মৃত্তিকার বিকার মাত্র, এইজড়, মৃত্তিকা বিকারের সম্মুখে, লোকে সজীব জীবকে বলিদান দেয়। সজীবকে নির্জীবের পূজার জন্য বলি দেয়, পরিণামের বিষয় কেহ বুঝে না ও পরমাত্মার নামের মহিমাও কেহ জানে না, এইজন্যই লোকে ভব সাগরে ডুবিয়া মরে। মিথ্যা দেব দেবীর পূজায় ব্যস্ত হইয়া পরব্রহ্মকে জানে না।

হে মনুষ্য ! তুমি কিজন্য পাষাণ পূজা করিতেছ ? এবং কিজন্যই বা আপন গলায় শিবলিঙ্গ লটকাইয়াছ ? কিজন্যই বা পূর্ব্বদিকে ঈশ্বর আছেন মনে করিয়া জগন্নাথাদি তীর্থে গমন কর ? এবং কিজন্যই বা পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মক্কাভিমুখে মস্তক অবনত কর ? মন্দবুদ্ধি পশুবৎ লোকেরা কেহ প্রতিমা পূজা করে, কেহ বা কবরকে পীর ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। অতএব কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই পরব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

হে মনুষ্য ! তুমি কিজন্য পাষাণ মূর্ত্তির পূজা করিতেছ ? পাষাণ ত পরমেশ্বর নহেন ! সেই প্রভুর পূজা ও উপাসনা কর, যাহাকে উপাসনা করিলে, তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইবে। ইত্যাদি অনেক শব্দ লেখা আছে, যাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, শিখদিগের ধর্ম্ম, আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধ।

আমি ইতঃপূর্ব্বে শিব পুরাণে, শিবের নাভি কমল হইতে কমল ও কমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; ব্রহ্মা, শিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট নারায়ণ জলাশয়ের জল লইয়া জলে প্রক্ষেপ করায়, জল বুদবুদ উৎপন্ন হইলে, তাহা হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছি। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি কমল হইতে উৎপন্ন হইয়া শিবকে সৃষ্টি করিলেন, যথা "ততো সৃজদ্ধাম দেবং ত্রিশূল বরধারিণম" ইত্যাদি। এইরূপে নারদীয় পুরাণে লিখিত

আছে যে, নারায়ণের দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণু ও মধ্য ভাগ হইতে মহেশ্বর অর্থাৎ শিব প্রকট হইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে, মহালক্ষ্মী হইতে বিষ্ণু, মহাকালী হইতে মহাদেব ও মহাসরস্বতী হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন; অর্থাৎ পুরাণে যে যে স্ত্রীকে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পত্নী বা স্ত্রী বর্ণন করিয়াছেন, তাহারাই তাহাদের মাতা। আমি পৌরাণিক মহাশয়দিগকে অধিক কি আর বলিব, শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।"

"স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই,যেরূপ শ্রেষ্ঠ লোকেরা আচরণ করেন, ইতর অর্থাৎ জন সাধারণ বা সেই শ্রেষ্ঠের ভক্তেরা তাহারই অর্থাৎ তদাচরণেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। এবং ঐ শ্রেষ্ঠ লোকের আচরণই তাহাদের প্রমাণ স্বরূপ। ভগবান মনুও সদাচার* এবং "আচারশ্চৈব সাধুনাম" আদিকেই অর্থাৎ সাধু বা শ্রেষ্ঠ জনের আচার ব্যবহারকেই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অঙ্গ বা লক্ষণস্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। যখন জন সাধারণে তাহাদের ইষ্টদেবতাদিগরে আচরণ কিরূপ, ও স্বার্থী দুষ্ট লোকেরা নিজ স্বার্থ সাধন জন্য, এবং লোককে বঞ্চিত করিবার জন্য, যে সকল দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদের উৎপত্তি বিষয় লিখিয়াছেন, যখন তাহা জ্ঞাত হইবেন, তখন কখনই তাহারা এরূপ অশ্লীল ও অপদার্থ দেবতাদিগের প্রতি আস্থা রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সাধারণ লোকে, এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও, অনেক স্থানে তাহাদের ইষ্টদেবতাদিগের উৎপত্তি বিষয় অবগত নহেন, কেবল বাল্যকাল হইতে অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ আর্য্য-সমাজের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বেদশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও অপরাপর উপধর্ম্মশাস্ত্র যথা—পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদির নিকৃষ্টত্ব ও অশ্লীলতাদির বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই আর্য্য-সমাজই পুনরায় বহুকালের পর, বৈদিকধর্ম্ম যে সমগ্র জগতের জন্য ঈশ্বর দয়াপরবশ হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ইহাই যে একমাত্র মানবের মানিবার উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য, তাহা সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করিয়াছে।

*বেদ স্মৃতিঃ সদাচার স্বসঃ চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এত চ্চতুর্ব্বিধং প্রাহু সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

আমাদের দেশে আধুনিক স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা বেদ শাস্ত্রকে একবারেই লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাঁরা বেদ শাস্ত্র দ্বিজ ব্যতীত, অপর কাহার পাঠের অধিকার নাই বলিয়া, জন সাধারণের সমীপ হইতে কাড়িয়া লইয়া, বেদের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। অধিক আর কি বলিব? জৈমিনী ঋষির পরে যে যে মহাত্মা বা আধুনিক পণ্ডিতগণ পতিত হিন্দু ধর্ম্মের ও কুসংস্কারের পুনরুদ্ধার বা সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারাও, কতক পরিমাণে নিজ নিজ কুসংস্কার ও কুলমর্য্যাদা ছাড়িতে পারেন নাই। লোকের বাল্য সংস্কার এত প্রবল হয় যে, অনেক সময় তাঁহারা অপরাপর সমস্ত বিষয় বিশেষ জ্ঞাত হইয়াও, সামান্য বিষয়ে অজ্ঞাত ভাবে নিজ ভ্রম সংশোধনে সমর্থ হন না। ইংরাজীতে এরূপ লোককে। Unconsciously dishonest বলা যায়। আমি প্রমাণ স্বরূপ দুই চারিটি উদাহরণ দিতেছি, যথা—

আমাদের দেশে প্রায় সকলেই অবগত আছেন, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মহাশয়, বেদ বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিরোধক আর্য্যাবর্ত্তের একজন শ্রেষ্ঠ উপদেশক, বিদ্বান ও বৈদিকধর্ম্মসংস্থাপক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিচার, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া, কিছুকালের জন্য বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় উপধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। যাহা হউক, এরূপ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও, বেদ যে মানব মাত্রেরই জন্য প্রচারিত হইয়াছে, এবং ইহার পঠন পাঠনের অধিকার যে স্ত্রীশূদ্র ও অতি শূদ্রাদি অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই জন্য আছে, *তাহা বৈদিক ও অপরাপর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, নিজ জাতীয় অভিমান ও বাল্য সংস্কার বশতঃ, স্বীকার না করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের কল্পিত প্রক্ষিপ্ত বচনের প্রমাণ দিয়া, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাধিকার নাই, তাহা বেদান্ত দর্শনের শারীরিক মীমাংসা ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। **এমন কি গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ †পর্য্যন্ত, তিনি স্বীকার করিতেন না; যাহা তিনি ঐ ভাষ্যেই বর্ণনা করিয়াছেন। যে

* মৎপ্রণীত স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ নামক পুস্তকে এ বিষয়ের ভূরি ভূরি বৈদিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে।

**বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় প্রপাঠকে ৩৫ হইতে ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে লিখিত আছে।

†মৎপ্রণীত বর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রমত নামক প্রবন্ধে এবিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে।

শঙ্করাচার্য্য মহাশয়, নবীন বেদান্ত বা অদ্বৈত বাদ প্রচার করিয়াছেন ; যাঁহাকে পুরাণাদিতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন, যিনি মুক্তি, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা বারংবার স্বীকার করেন ; তিনিও, যদি শূদ্রে বেদমন্ত্র পাঠ করে বা বেদশাস্ত্র শ্রবণ করে, তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ ও কর্ণে তপ্ত সীসক গলাইয়া প্রবেশ করান কর্ত্তব্য, ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রক্ষিপ্ত বচনকে, সংস্কার বশতঃ প্রমাণ স্বরূপে বর্ণন করিতে ক্রটী করেন নাই। যে শঙ্করাচার্য্য মহাশয় মিথ্যা মায়াবাদ প্রচার করিয়া, জাগতিক সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বা মায়া বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ; যিনি জড় শরীর আত্মা নহে, ইহা ক্ষণভঙ্গুর ; ও শরীরে আত্মজ্ঞান করাই, অবিদ্যা বলিয়া বার বার ডঙ্কা মারিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; এমন কি, যিনি সমস্ত পদার্থকেই ব্রহ্মময় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ; যিনি মানবাদি জীবরূপ অবস্থাকে মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে এরূপ স্বীকার করিয়াছেন ; যিনি এমন কি, সুখ দুঃখ, স্বর্গ ও নরকাদি, অবিদ্যা জন্য কল্পিত পদার্থমাত্র স্বরূপতঃ ইহারা সমস্তই মিথ্যা বলিয়া গিয়াছেন ; তিনিও, সংস্কার বশতঃ, শূদ্র অর্থাৎ শূদ্র শরীর প্রাপ্ত হইলে, বেদ পাঠ করিয়া, মিথ্যাজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ নহে, এরূপ স্বীকার করেন।

মনীষাপঞ্চকে লিখিত আছে যে, একদা শঙ্করাচার্য্য কাশীধামে গঙ্গাস্নান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়, পথে একটী চণ্ডালকে দেখিয়া, তিনি ঘৃণা পূর্ব্বক সরিয়া যাও এরূপ বলিলেন। তাহাতে চাণ্ডাল প্রত্যুত্তর করিল যে, আপনি কাহার প্রতি ঘৃণা করিয়া সরিয়া যাও বলিলেন ? আপনি এই মলময় পঞ্চকোষরূপ জড় শরীরকে সরিয়া যাও বলিলেন, কিম্বা চৈতন্যকে সরিয়া যাও বলিলেন ? আমার শরীর মধ্যে কোন্‌টি চাণ্ডাল এবং কোন্‌টি ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন ? ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া, পরে তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে দেখুন, নানক, কবির, দাদু আদি অনেক সাধুরা, যদিচ মূর্ত্তি পূজার ভয়ানক বিরোধী ছিলেন, ও তাহাদের নিজ নিজ পুস্তকে ইহার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন ; তথাপি, পুরাণের কল্পিত ব্রহ্মা, শালগ্রাম, তুলসী, বিষ্ণু ও দশ মহাবিদ্যা আদির মূর্ত্তি, যাহাদিগের লোকে সচরাচর পূজা করে, সেই সমস্তের ইতিহাস যে কথঞ্চিৎ সত্য, তাহা সংস্কার বশতঃ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যিনি বিষ্ণুভক্তমাত্রকেই শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ও যিনি দ্বিজ ও বৈষ্ণবদিগের পদরজ লইতে ক্রটী করেন নাই, তিনিও, বাল্য সংস্কার বশতঃ, অনেক সময় হরিদাস আদি যবন ভক্ত, যিনি নিজ শরীরকে যখন শরীর বলিয়া জ্ঞান করিতেন ও যিনি শ্রীজগন্নাথ দেব (যাহাকে তাহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতেন) পাছে তাহার স্পর্শে অপবিত্র হন, এজন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না ; এবং এইরূপ প্রবেশ না করার জন্য, চৈতন্যদেব তাহাকে বড়ই প্রশংসা করিতেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা আছে। তিনি কতকটা ভক্তির ভাব জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ হইতে পৌরাণিক দেব দেবী এবং তাহাদের ইতিহাস যে সত্য, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তৎপরে তিনি বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ দেবতা ও অপরাপর শিব আদি দেবতা যে বিষ্ণুর অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ও দাস স্বরূপ, তাহা স্বীকার করিতেন। তিনি আধুনিক ভাগবত গ্রন্থকেই সর্ব্বোপরি প্রমাণীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন, যাহাকে আমরা ইতঃপূর্ব্বে খণ্ডন করিয়াছি। তৎপরে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াও স্ত্রীর সহিত যদিচ বাহ্যভাবে স্ত্রীভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরের সহিত পারেন নাই ; কারণ তিনি নিজ স্ত্রীকে আপনার সম্মুখে আসিতে দেন নাই, এজন্য তাহার মনে যে সম্পূর্ণ বিরাগ ও স্ত্রী সম্বন্ধে সমভাব আসিতে পারে নাই, ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ যদি তাহার মিত্র, বৈরী, স্ত্রী, পুংস, আদির প্রতি সমভাব থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায়, সন্ন্যাস গ্রহণের পর, স্ত্রীকেও ঠিক অপরাপর লোকের ন্যায় উপদেশ দিতে সমর্থ হইতেন। এইরূপে তিনি মাতাকে মাতা বলিয়া জ্ঞান করিতে সমর্থ হন নাই। যে জন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহাকে শাস্ত্রমতে, সকলের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন কি, আধুনিক সন্ন্যাসীরা, অর্থাৎ দশনামী সন্ন্যাসীরাও, সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে, নিজের দেহের শ্রাদ্ধাদি করাইয়া, পরে সন্ন্যাস লন ; ও জগতের সহিত তাহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভর্ত্তার ঐ শরীর লইয়া যে জাগতিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পরে তাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যাহা হউক এ বিষয় আমরা অন্য প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিব।

অনেক সাধুরা, বিষ্ঠা ও চন্দনাদিতে সমজ্ঞান আছে বলিয়া, বিষ্ঠা খাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকেরা এরূপ মহাত্মাদিগের বাস্তবিকই সমজ্ঞান আছে মনে করেন। পরন্তু, একটু বিবেচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যখন

ঐ সাধু বলিতেছেন, দেখ আমি বিষ্ঠা খাইতেছি, তখনই তাহার ঐ পদার্থ যে বিষ্ঠা, তদ্বিষয় বিশেষ জ্ঞান আছে, ও তিনি বিষ্ঠা খাইতেছেন, এই কথা বলাতেই, তাহার অহঙ্কার প্রকাশ করা হইতেছে; অর্থাৎ অপরে যাহা খাইতে পারে না, পরন্তু তিনি তাহা খাইতে পারেন, ইহাই তিনি বলিতেছেন। যে জনের সমজ্ঞান হইবে, তিনি কখনই এরূপ বলিবেন না। চৈতন্যদেব নিজ স্ত্রীকে সম্মুখে আসিতে দেন নাই এজন্য তাহার সন্ন্যাস লওয়া সত্ত্বেও সেই স্ত্রীর প্রতি স্ত্রীভাব পরিত্যক্ত হয় নাই; কারণ যদি তাহার মন হইতে নিজ পত্নীর প্রতি স্ত্রীভাবে দূরীভূত হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিনি অপরাপর স্ত্রীর ন্যায়, তাহাকেও সম্মুখে আসিতে আজ্ঞা দিতে পারিতেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের বিচার আমরা অপর প্রবন্ধে করিব।

রামানুজ আদি পণ্ডিতগণ, যদিচ জীব ব্রহ্ম বিষয় বিশেষরূপে বিচার করিয়াছেন, এবং জীবমাত্রেই কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, বাস্তবিক জীব জাতি নহে, এবং জীবের কর্ম্মানুসারে গতি প্রাপ্তি হয়, এরূপ স্বীকার করিয়াও, ক্ষুদ্র সংস্কারের বশীভূত হইয়া, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাধিকার নাই, তাহা স্বীকার করিতেন; এবং জীবব্রহ্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়াও আপন ইষ্ট রাম কৃষ্ণাদিকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

মহাত্মা বুদ্ধদেব, যিনি কি উপায়ে লোকে ত্রিতাপ হইতে ত্রাণ পাইতে সমর্থ হইবে, এইজন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন; যিনি বিচার বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন, তিনিও, সংস্কার বশতঃ, অবিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মকেই, ভ্রমে পতিত হইয়া, বৈদিক ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি রাবণ, উব্বট মহীধরাদির বেদ প্রতিকূল বেদভাষ্যকে, বেদের প্রকৃত অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি এতদূর বিজ্ঞ হইয়াও, বেদের প্রকৃত অর্থ যে অষ্টাধ্যায়ীব্যাকরণ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, নিরুক্ত ও নিঘণ্টু আদি বেদাঙ্গের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। কারণ, যদি তিনি এবিষয় জ্ঞাত হইতেন, তবে কখনই তিনি বেদে হিংসার বিধি আছে, বেদে অশ্লীল বিষয় লিখিত আছে, ইত্যাদি বেদ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, বেদকে কদাপি পরিত্যাগ করিতেন না। আমরা দেখিতে পাই যে, অনেক সময় পণ্ডিতেরাও সামান্য বিষয়ে ভ্রমে পতিত হন। দেখুন যেরূপ প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্র গৌতম ঋষির দর্শনে প্রকাশিত আছে, যাহার বাৎস্যায়ন আদি ঋষিরা যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে লোকে সেই ন্যায়ের ফাকড়া বাহির করিয়া, তাহার ভাষ্য করিতে আরম্ভ করিয়া নবীন ন্যায় শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া

ফেলিলেন। এক্ষণে গদাধর ও রঘুনাথ শিরোমণির টীকা যাহা বাস্তবিক গৌতমের ন্যায় শাস্ত্রের বিরোধী, তাহাকেই পণ্ডিতেরা ন্যায় বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করেন; এবং তাহাকেই (আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষতঃ আজকাল ভারতবর্ষের মধ্যে ন্যায়ের প্রধান স্থান নবদ্বীপে) প্রকৃত ন্যায় বলিয়া লোকে ও পণ্ডিতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে অনেক সময় প্রকৃত বিষয় লোপ পাইয়া, তাহার অপ্রকৃত নকলকে লোকে আসল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেবের সময়, এইরূপে বেদের অপ্রকৃত ভাষ্যের মতানুযায়ী বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল, বুদ্ধদেব সেই ধর্ম্মকে হিংসা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ দেখিয়া, তাহাকেই বৈদিক ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বিনা বিচারেই যথার্থ বৈদিকধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিলেন। আমি অধিক আর কি লিখিব, আমাদিগের বাল্য সংস্কার এতদূর প্রবল হয় যে, অনেক সময় আমরা কোন বিশেষ দ্রব্যকে, মিথ্যা কল্পনামাত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াও, ছাড়িতে পারি না। যেরূপ অন্ধকারে কোন দ্রব্য নড়িলে, বাল্য সংস্কার বশতঃ, অনেকে বিচারে ভূত নাই, ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, ভূতের ভয় প্রাপ্ত হন। এইরূপে অনেক বেদান্তী মহাশয়েরা মূর্ত্তি কল্পনা মাত্র জ্ঞাত হইয়াও, এবং মুখে বেদান্তের ছটা উড়াইয়াও, কালী বা তারকেশ্বর আদি বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারেন না; ও মনে মনে ভয় করেন যে, পাছে প্রণামাদি না করিলে, ওই ঠাকুরেরা তাহার অপকার করিবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জৈমিনি ঋষির পর হইতে, বর্ত্তমান কালে, আর্য্যাবর্ত্তে অতি অল্পই আপ্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা কিছু অল্প লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের শিষ্যেরা অনেক সময় তাহাদিগের গুরুর প্রকৃতভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। এবং প্রথমে যদিচ দুই চারি জন তাহাদের মত কথঞ্চিৎ গ্রহণ বা বুঝিতে সমর্থও হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের শিষ্যেরা, অনেক সময়, একবারেই সেই মতের গোঁড়াভক্ত হইয়া, প্রকৃত মতের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া ফেলিয়াছেন। দেখুন, নানক ও অন্যান্য শিখ্‌গুরুরা, একবারেই মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। কোন স্থানে জড় পদার্থের পূজা করিতে তাঁহারা আদৌ আদেশ দেন নাই। সর্ব্বত্রই নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আধুনিক শিষ্যেরা সামান্য পুস্তককে, অর্থাৎ গ্রন্থসাহেবকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ও তাহার অর্থাৎ গ্রন্থসাহেবের, কড়াপ্রসাদরূপে ভোগ দেওয়া হয়। হিন্দুদিগের কতকগুলি তীর্থের ন্যায়, আধুনিক শিখ্‌গণ যে স্থানে নানক বা অন্যান্য গুরুরা দাঁড়াইয়াছিলেন, খাইয়াছিলেন,

শুইয়াছিলেন বা কোন বিশেষ বৃক্ষের তলায় শয়ন করিয়াছিলেন, এরূপ স্থানকে তীর্থ জ্ঞান করেন ; ও তথায় গিয়া দর্শনাদি করিয়া পূত হন, এরূপ তাহাদের বিশ্বাস। মৃত ব্যক্তির সমাধিকে পূজা করা, গ্রন্থসাহেবে একবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু আধুনিক শিখেরা অনেক স্থলে ঐরূপ করিয়া থাকেন। তৎপরে তাহারা ক্রমেই হিন্দুর দেব দেবীকে মানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অনেক সময় আবার, এক নামের অনেকগুলি গ্রন্থকার হওয়ায়, বাস্তবিক কোন্‌টি আসল গ্রন্থকারের রচনা, তাহা ঠিক করা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। যেরূপ শঙ্করাচার্য্যের মঠে, যে কেহ অধিকারী বা মহান্ত হন, তাহাকেই শঙ্করাচার্য্য উপাধি দেওয়া যায়। বলিতে কি, বিস্তর গ্রন্থাদি এরূপ বাজে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, যাহা আসল বলা প্রকৃত শঙ্করাচার্য্যের কৃত বলিয়া অনেকে মনে করেন ; যথা অপরাধভঞ্জন, গঙ্গাস্তোত্র আদি গ্রন্থগুলি প্রকৃত শঙ্করস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া অনেকের ধারণা। পরন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ, হয় কোন ধূর্ত্ত, শঙ্করাচার্য্যের নাম দিয়া, অথবা অন্য কোন আধুনিক শঙ্করাচার্য্য প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। অনেক সময় দুষ্টলোকেরা, নিজমত সমর্থন করিবার জন্য, প্রাচীন গ্রন্থে নিজ নিজ মতানুযায়ী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে মনুসংহিতাতে ও মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদা মহারাজা ভোজ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন ; যে আসল মহাভারতে মোটে ৬০০০ শ্লোক ছিল, পরন্তু তাঁহার সময় ত্রিশ হাজার শ্লোক মহাভারতে দৃষ্ট হয়। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক দৃষ্ট হইবে। বাস্তবিক তাঁহার কথা মিথ্যা হয় নাই। হরিবংশ লইয়া বাস্তবিকই মহাভারতের এখন লক্ষ শ্লোক হইয়াছে। তৎপরে অনেক সময় আমাদের দেশের লোকেরা গুরুকে বাড়াইতে গিয়া, পরমেশ্বর অপেক্ষাও অধিক বাড়াইয়া ফেলিয়া থাকেন ; এবং স্বার্থী গুরুদেবেরাও, লোকদিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য, কল্পিত মতও প্রচার করিতে ত্রুটী করেন না যথা—

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে সে পাপী নরকে মজে

এবং

শিবেরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরোরুষ্টে ন কশ্চন ইত্যাদি।

এই সমস্ত কথা আধুনিক হিন্দুমাত্রেই প্রায় বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অনেক সময় কৃতবিদ্য লোকেরাও, তাহাদের মনুষ্য গুরুকে ঈশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে ও স্বীকার করিতে লজ্জিত হন না। (অনেকেই রামকৃষ্ণ পরমহংস

মহাশয়কে জানিতেন ; তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু তাঁহাতে কোন ঐশ্বরিক শক্তি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালীন আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি যে সাধারণ মানবের ন্যায় পীড়ার জন্য কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাঁহা আমাদিগের কাছে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। অবশ্য সে সময় তিনি কষ্ট পাইয়াও, ঈশ্বরকে ভুলেন নাই। তিনি কখনও আপনাকে ঈশ্বর সদৃশ ব্যক্তি বলিতেন না। যদি কেহ তাহাকে ঐরূপ বলিত, যদি কেহ তাহাকে ঐরূপ বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ, ক্রোধ ও শোক প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে একেবারে শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ একাধারে রামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন ; এবং তাঁহার মূর্ত্তির, রাম কৃষ্ণ, শিব দুর্গার মূর্ত্তির ন্যায় পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। লোকে যেরূপ ভোগ, নৈবেদ্য, ও অপরাপর প্রকারে, বিগ্রহের সেবা করে, ইহারাও তদ্রূপে তাঁহার অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মৃতদেহের ভস্মাবশেষকে, একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া, তাহারই সমাধি করিয়া, পূজাদি দিয়া থাকেন। অনেকে আবার তাহার প্রতিমূর্ত্তিরও পূজা করেন। এইরূপে আর একটি লোক, কাশীপুরে জীবিত আছেন, যাহাকে তাহার শিষ্যেরা মহীমচন্দ্র অবধূতবাগীশ বা অদ্ভুত বাগীশ বলিয়া থাকেন ; এই মহাপ্রভুকেও তাহার শিষ্যেরা ভগবান বলিয়া জ্ঞান করেন। এইরূপে আরও অনেকে পরমহংসাদি আছেন, যাহার শিষ্যেরা তাহাকে কল্কি অবতার বলিয়া প্রচার করেন।) অনেক সময়, আবার কোন কোন স্বার্থপর গুরুদেবেরা, শিষ্যদিগকে এরূপ উপদেশ করেন যে, যদি তাহাদের গুরু লোভী হন, তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বামন অবতার বলিয়া জ্ঞান করিবে ; এবং বলি রাজার ন্যায় তাঁহাকে সর্বস্ব দান করা কর্ত্তব্য ; এবং এরূপ করিলেই তাহারা ভগবানকে দ্বারী স্বরূপে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন। যদি তাহাদিগের গুরু ক্রোধী হন, তবে তাঁহাকে নৃসিংহদেব বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য ; এবং তাহার সেবা করিয়া, প্রহ্লাদের ন্যায় ত্রাণ পাইবে। অবশ্য এরূপ স্থলে গুরুদেবেরা বীরভদ্রের নিকট হইতে নৃসিংহদেব যে যে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পাইতে ইচ্ছা করেন না। যদি গুরু কামী হন, এবং তজ্জন্য যদি তিনি নিজ গৃহে বা শিষ্যালয়ে বা অপর স্থানে ব্যভিচার দোষে দূষিত হন, তবে তাহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ জ্ঞান করিবে ; এবং যেরূপ ব্রজাঙ্গনারা শ্যামের সেবা করিয়া

সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমরাও সেই গুরুদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সেবা করিলে, ত্রাণ পাইবে সন্দেহ নাই। বলিতে কি, ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে গোকুলিয়া গোঁসাই, নারায়ণ স্বামী, রাধাস্বামী ইত্যাদি, অনেক গুরু সম্প্রদায়ের শিষ্য কন্যাদিগের সহিত ব্যভি চার দোষে দূষিত হইয়া, ইংরাজদিগের সুবিচার শ্রীঘর দর্শন করায়, এইরূপ পাপের স্রোত অনেক পরিমাণে ক্ষান্ত হইয়াছে। আমি এই সমস্ত নবীন সম্প্রদায়ের ব্যভিচার বিষয় লিখিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করিতে চাহি না। বঙ্গদেশে, কর্ত্তাভজার দলেও, কতক পরিমাণে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যাহা হউক এবিষয়ের বিচার আমি গুরু শিষ্য প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছি; যাহার আবশ্যক হইবে, তিনি উহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। আমাদিগের দেশের গুরুরা লোককে ঠকাইবার জন্য আরও বলিয়া থাকেন, যে—

বেদ শাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

অর্থাৎ বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণাদিকে সামান্য বারাঙ্গনার ন্যায় জানিবে; কারণ যাহার ইচ্ছা তিনিই ইহাদিগকে উপভোগ, অর্থাৎ গ্রহণ বা পঠন পাঠন করিতে পারেন। পরন্তু গুরু পরম্পরা শাম্ভবী বিদ্যা, যাহা তাহারা কানে ফুকিয়া দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত গুপ্ত ও তাহা কুলবধূর ন্যায়, কাহার নিকট প্রকাশ বা বলিবার পদার্থ নহে। এজন্য গুরু মন্ত্র কি? তাহা অপরে জানিতে না পারেন। এরূপ বলার অর্থ আর কিছুই নহে, পাছে তাহাদিগে বিদ্যা লোক জানিতে পারে, এবং তাহাদের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া, শিষ্যের চক্ষু ফুটিয়া যায়, এজন্যই আধুনিক গুরুদেবেরা যাহাতে শিষ্যেরা মূর্খ ও পশুবৎ হইয়া থাকে ও অকাতরে ভ্রম বিশ্বাসে পতিত হইয়া, তাহাদিগকে বিস্তর অর্থ প্রদান করে, ইহাই সদা সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। এইরূপ গুরুরা অনেক সময় তাহাদিগের নিজ নিজ উপদেশ পুস্তকে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য, অনেক শ্লোক বা কথা প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। ভাগ্যক্রমে, বেদের সংহিতাভাগে, কেহ কোন মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত করিতে পারেন নাই। কারণ লোকে বেদ, গুরু-শিষ্য পরম্পরা শুনিয়া, শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ষড়দর্শনের মূলে প্রক্ষিপ্ত সূত্র অতি অল্পই আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও উপনিষদে লোকে অধিক কিছুই বদলাইতে পারেন নাই। পরন্তু আধুনিক ধূর্ত্তেরা, অনেক সময় আদত উপনিষদের স্থানে, উপউপনিষদ অনেক প্রচার

করিয়াছেন, যথা রামতাপিণী, নৃসিংহতাপিণী ইত্যাদি। অধিক আর কি বলিব, মুসলমানের রাজত্বকালে আল্লোপনিষদ্ প্রণয়ন করেন; যাহাকে সাধারণে অথর্ব্ববেদের অঙ্গ বলিয়া থাকেন। এমন কি চৈতন্যদেব, যিনি বাবরের সময় বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নামেরও চৈতন্যউপনিষদ নামক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে; ও কিছুদিন পরে তাহাও, আধুনিক হিন্দুদিগের প্রমাণ পুস্তক হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশের আর একটি কুসংস্কার এই যে, লোকে যদি বৈদিক ধর্ম্মকেও ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন, তবে তাহাকে প্রমাণ বলিয়া লোকে স্বীকার করিবে না; কিন্তু যদি একটা কল্পিত শ্লোক লোকে রচনা করেন, তবে তাহাকেই বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আধুনিক হিন্দুরা আর্য্য সমাজের উপর মিথ্যা দোষারোপ করেন যে, আর্য্য-সমাজীরা হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দাকারী। বাস্তবিক এক মতাবলম্বী হিন্দুরাই যে, অপর মতাবলম্বীদিগের ভয়ানক বিরোধী, তাহা তাহারা আদৌ স্বীকার করেন না। আমি ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এক প্রকার পুরাণে, এক প্রকার দেবতার স্তুতি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ও অপরাপর দেবতার নিন্দা ও অপমান বিষয় লিখিত আছে। অধিক আর কি লিখিব, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, শিব, ব্রহ্মা, গণেশাদি দেবতার অপমান, এবং ঐ সকল দেবতা বিষ্ণু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন লিখিত আছে। কেবল এইরূপ লিখিয়াই পুরাণকর্ত্তারা সন্তুষ্ট হন নাই, অনেক সময় বৈরনির্য্যাতন জন্য অপরের ইষ্টদেবকে নিজ নিজ ইষ্টদেব কর্ত্তৃক হত্যা পর্য্যন্ত করাইতে ত্রুটি করেন নাই। আমি উদাহরণস্বরূপ এস্থলে একটি পুরাণের কথা বর্ণন করিব। বৈষ্ণব মতাবলম্বীরা নৃসিংহদেবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ বলিয়া জ্ঞান করেন। এইজন্য শৈবেরা বিষ্ণুর নিন্দা করিবার জন্য, বিশেষতঃ, বৈষ্ণবদিগের সহিত বৈরনির্য্যাতন সাধন জন্য, নৃসিংহদেবকে নিজইষ্ট দ্বারা, পশুবৎ হত্যা করাইয়া, তাহার শরীরের চর্ম্ম পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

লিঙ্গ পুরাণে *৯৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে;—

---

* বঙ্গবাসী যন্ত্রালয় হইতে যে লিঙ্গ পুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উপরের লিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

লিঙ্গ পুরাণ – ৯৬ অধ্যায়

ওঁ

অথ নৃসিংহ বধঃ। ঋষয় উচুঃ।

কথং দেবো মহাদেবো বিশ্বসংহারকারকঃ।
শরভাখ্যং মহাঘোরং বিকৃতং রূপমাস্থিতঃ।
কিং কিং ধৈর্য্যাকৃতং তেন ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ

এবমভ্যর্থিতো দেবৈর্মতিং চক্রে কৃপালয়ঃ।
যত্তেজস্তু নৃসিংহাখ্যং সংহর্তুং পরমেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
তদর্থে স্মৃতবান রুদ্রো বীরভদ্রং মহাবলম্।
আত্মনো ভৈরবং রূপং মহাপ্রলয়কারকম্ ॥৩॥
আজগাম পুরা সদ্যো গণানামগ্রতো হসন্।
সাট্টহাসৈর্গণবরৈরুৎপতদ্ভিরিতস্ততঃ ॥৪॥
নৃসিংহরূপৈরত্যুগ্রৈঃ কোটিভিঃ পরিবারিতঃ।
তাবদ্ভিরভিতো বীরৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চ মুদান্বিতৈঃ ॥৫॥
ক্রীড়দ্ভিশ্চ মহাঘোরৈর্ব্রহ্মাদ্যৈঃ কন্দুকৈরিব।
অদৃষ্টপূর্ব্বৈরন্যৈশ্চ বেষ্টিতো বীরবন্দিতঃ ॥৬॥
কল্পান্ত জ্বলন জ্বালোবিলসল্লোচন ত্রয়ঃ।
আত্তশস্ত্রো জটাজূটে জ্বলদ্বালেন্দুমণ্ডিতঃ ॥৭॥
বালেন্দু দ্বিতীয়াকারতীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঙ্কুরদ্বয়ঃ।
আখণ্ডল ধনুঃখণ্ড সন্নিভভ্রূলতাযুতঃ ॥৮॥
মহা প্রচণ্ড হুঙ্কার বধিরীকৃত দিঙ্মুখঃ।
নীলমেঘাঞ্জনাকারো ভীষণ শ্মশ্রুরদ্ভুতঃ ॥৯॥
বাদখণ্ড মখণ্ডাভ্যাং ভ্রাময়ং ত্রিশিখং মুহুঃ।
বীরভদ্রোঽপি ভগবান্ বীরশক্তি বিজৃম্ভিতঃ ॥১০॥
স্বয়ং বিজ্ঞাপয়ামাস কিমত্র স্মৃতি কারণম্।
আজ্ঞাপয় জগৎস্বামিন্ প্রসাদ ক্রিয়তাং ময়ি ॥১১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অকালে ভয়মুৎপন্নং দেবানামপি ভৈরব।
জ্বলিতঃ স নৃসিংহাগ্নিঃ শময়ৈনং দুরাসদম্ ॥১২॥
সান্ত্বয়ন্ বোধয়াদৌতং তেন কিং নোপশাম্যতি।
ততো মৎ পরমং ভাবং ভৈরবং সম্প্রদর্শয় ॥১৩॥
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মেন সংহৃত্য স্থূলং স্থূলেন তেজসা।
বক্ত্রমানয় কৃত্তং চ বীরভদ্র মমাজ্ঞয়া ॥১৪॥
ইত্যাদিষ্টো গণাধ্যক্ষঃ প্রশান্ত বপুরাস্থিতঃ।
জগাম রংহসা তত্র যত্রাস্তে নরকেশরী ॥১৫॥
ততস্তং বোধয়ামাস বীরভদ্রো হরোহরিম্।
উবাচ বাক্য মীশানঃ পিতা পুত্র মিবৌরসম্ ॥১৬॥

বীরভদ্র উবাচ।

জগৎ সুখায় ভগবন্নবতীর্ণোঽসি মাধব।
স্থিত্যর্থে চ নিযুক্তোঽসি পরেণ পরমেষ্ঠিনা ॥১৭॥
বিভর্ষি কূর্ম্মরূপেণ বারাহেণোদ্ধৃতা মহী।
অনেন হরিরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥১৯॥
অতস্ত্বং ঘোরং ভগবন্ নরসিংহ বপুস্তব।
উপসংহর বিশ্বাত্মংস্ত্বমেব মম সন্নিধৌ ॥২৪॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তো বীরভদ্রেণ নৃসিংহঃ শান্তয়া গিরা।
ততোঽধিকং মহাঘোরং কোপং প্রজ্বলয়ন্বিভিঃ ।২৫॥

নৃসিংহ উবাচ।

আগতোঽসি যতস্তত্র গচ্ছত্বং মাহিতং বদ।
ইদানীং সংহরিষ্যামি জগদেতচ্চরাচরম্ ॥২৬॥
মন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতঃ পুরাব্রহ্মা চতুর্মুখঃ।
তল্ললাটাং সমুৎপন্নো ভগবান বৃষভধ্বজঃ ॥
কালোঽস্ম্যহং কালবিনাশহেতুর্লোকান্ সমাহর্ত্তু মহং প্রবৃত্তঃ।
মৃত্যোর্মৃত্যুংবিদ্ধি মাং বীরভদ্র জীবন্ত্যেতে মৎ
প্রসাদেন দেবাঃ ॥২৫॥

সূত উবাচ।

সাহংকার মিদং শ্রুত্বহরেরমিত বিক্রমঃ।
বিহস্যোবাচ সাবজ্ঞং ততোবিস্ফুরিতাধরঃ ॥২৬॥

বীরভদ্র উবাচ।

কিং ন জানাসি বিশ্বেশং সংহর্ত্তারং পিনাকিনম্।
অসদ্বাদোবিবাদশ্চ বিনাশস্ত্বয়ি কেবলঃ ॥২৭॥
তবান্যোন্যাবতারাণি কানি শেষাণি সাম্প্রতম্।
কৃতানি যেন কেনাপি কথা শোষো ভবিষ্যতি ॥২৮॥
দোষং ত্বং পশু এতং ত্বমবস্থয় মীদৃশীং গতঃ।
তেন সংহারদক্ষেণক্ষণাং সংক্ষয়মেষ্যসি ॥২৯॥
প্রকৃতিস্ত্বং পুমান্ রুদ্র ত্বয়িবীর্য্যং সমাহিতম্।
ত্বন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতঃ পঞ্চবক্ত্রঃ পিতামহঃ ॥৪০॥
নত্বং স্রষ্টা ন সংহর্ত্তা ন স্বতন্ত্রাংহি কুত্রচিৎ।
কুলালচক্রবজ্জ্বত্তা প্রেরিতোসি পিনাকিনা ॥৪৫॥
অদ্যাপি তব নিক্ষিপ্তং কপালং কূর্ম্মরূপিণঃ।
হরলাল লতা মধ্যে মুগ্ধ কস্মান্নবুধ্যসে ॥৪৬॥
বিস্মৃতং কিং তদংশেন দংষ্ট্রোং পতন পীড়িতঃ।
বারাহ বিগ্রহস্তোদ্রাসাক্রোশং তারকারিণা ॥৪৭॥
দগ্ধোসি যস্য শূলাগ্রে বিষ্বব সেন সেনচ্ছলাম্ভবান।
দক্ষযজ্ঞে শিরশ্ছিন্নং ময়া তে যজ্ঞরূপিণঃ ॥৪৮॥
নির্জ্জিতস্ত্বং দধীচেন সংগ্রামে সমরুদ্গণঃ।
কণ্ডুয়মানেশিরসি কথং তদ্বিস্মৃতং ত্বয়া ॥৫০॥
চক্রং বিক্রমতো যস্য চক্রপানে তব প্রিয়ম্॥
কৃতঃ প্রাপ্তং কৃতং কেন ত্বয়া তদপি বিস্মৃতম্ ॥৫১॥
তে ময়া সকলা লোকা গৃহিতাস্ত্বং পয়োনিধৌ।
নিদ্রা পরবশঃ শেতে স কথং সাত্বিকোভবান্ ॥৫২॥
শাস্তা শোষস্য জগতো ন ত্বং নৈব চতুর্মুখঃ।
ইত্থং সর্ব্বং সমালোক্য সংহারাংমানামস্থনা ॥৫৮॥

নোচেদিদানীং ক্রোধস্য মহাভৈরব রূপিণঃ।
বজ্রশনিরিবস্থাণোস্ত্বেবং মৃত্যুঃ পতিষ্যতি ॥৫৯॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তো বীরভদ্রেন নৃসিংহঃ ক্রোধবিহ্বলঃ।
ননাদতনুবেগেন ত গৃহীতুং প্রচক্রমে ॥৬০॥
অত্রান্তরে মহাঘোরং বিপক্ষ ভয়কারণম্।
গগনব্যাপি দুর্ঘষং শৈবতেজঃ সমুদ্ভবম্ ॥৬১।
সহস্র বাহুজটিলশ্চন্দ্রার্ধকৃতশেখরঃ।
সমৃগার্ধশরীরেণ পক্ষাভ্যাং চঞ্চুনাদ্বিজাঃ ॥৬৬॥
স্পষ্ট দংষ্ট্রোঽধরোষ্ট্রশ্চহুংকাররেণ যুতোহরঃ।
হরিস্তদ্দর্শনা দেব বিনষ্ট বলবিক্রমঃ ॥৬৯॥
বিভ্রদৌর্ভাং সহস্রাংশো রধঃখদ্যোত বিভ্রমম্।
অথ বিভ্রভা পক্ষাভ্যাং নাভিপাদেভ্যুদারয়ন্ ॥৭০॥
পাদাবাবধ্যাপুচ্ছেন বাহুভ্যাং নিজ গ্রাহহরোহরিম্ ॥৭১॥
ততো জগাম গগনং দেবৈঃ সহ মহর্ষিভিঃ।
সহ সৈব ভয়াদ্বিষ্ণুং বিহগশ্চ যথোরগম্ ॥৭২॥
উৎক্ষিপ্যোৎক্ষিপাসংগৃহ্য নিপাত্য চ নিপাত্য চ।
উড্ডীয়োড্ডীয় ভগবান্ পক্ষাঘাত বিমোহিতম ॥৭৩॥
নীয়মানঃ পরবশো দীনবক্ত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
তুষ্টাব পরমেশানম্ হরিস্ত ললিতাক্ষরৈঃ ॥৭৭॥

নৃসিংহ উবাচ।

নমো রুদ্রায় শর্বায় মহাগ্রাসায় বিষ্ণবে।
নম উগ্রায় ভীমায় নমঃ ক্রোধায় মন্যবে ॥৭৬॥

সূত উবাচ।

নাম্না মষ্টশতে নৈবং স্তুত্বামৃত ময়েন তু।
পুনস্তু প্রার্থয়ামাস নৃসিংহঃ পরমেশ্বরম্ ॥৯৫॥
এবং বিজ্ঞাপয়ন্ প্রীতিং শঙ্করং নরকেশরী।
যদা যদা নমাতাতন মতাহঙ্কার দূষিতম্।
তদাতদাপনেতব্যং ত্বয়ৈব পরমেশ্বরম ॥৯৬॥
নম্বশক্তোভবান্ বিষ্ণো জীবিনাস্তং পরাজিতঃ ॥৯৭॥

তন্মত্ত শেষ মাত্রান্তং কৃত্বা সর্ব্বসা বিগ্রহম্।
শুক্তিশিতাং তদাভঙ্গং বীরভদ্রঃ ক্ষণাত্ততঃ ॥৯৮॥

দেবা উচুঃ।

অথ ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে বীরভদ্রত্বয়া দৃশা।
জীবিতাঃস্মোবয়ং দেবাঃ পর্জ্জন্যোনেবপাদপাঃ ॥৯৯॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ বীরভদ্রো মহাবলঃ।
অপশান্ সর্ব্বভূতানাং তত্রৈবান্তরবীয়ত ॥১১৪॥
নৃসিংহ কৃত্তিবসনস্তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ।
বক্তুং তন্মুণ্ডমালায়াং নায়কত্বেন কল্পিতম্ ॥১১৫॥
ইতি শ্রীলিঙ্গ পুরাণান্তর্গতে পঞ্চবতিতমেঽধ্যায়ে
নৃসিংহবধাখ্যাং প্রকরণং সমাপ্তম্।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে,—মুনীশ্বরগণ সূতগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং সূতগোস্বামী বলিতেছেন,—মুনীশ্বরগর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুতগোস্বামী! কিরূপে মহাদেব মহাঘোর শরভের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; এবং ঐ রূপ ধারণ করিয়া কি কি পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন? সূত বলেলেন :—

হে মুনীশ্বরগণ! দেবতাদিগের স্তবে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া, নৃসিংহরূপ সংহার জন্য, আপনার অংশসম্ভূত মহাপ্রলয়কারী ভৈরবরূপী বীরভদ্রকে স্মরণ করিলেন। তখন বীরভদ্র অট্টহাস হাঁসিতে হাঁসিতে নৃসিংহ অপেক্ষা কোটিগুণ উগ্ররূপ ধারণ করিয়া, তদপেক্ষা ও অধিক এবং ভয়ানক নৃত্য করতঃ, ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার তিনটি নেত্র প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত, জটাজুট চন্দ্রকলাযুক্ত ও হস্তে সকল প্রকার অস্ত্র সংযুক্ত ছিল। এই বীরভদ্র তখন মহা প্রচণ্ড হুঙ্কার করিতেছিলেন, যাহা শ্রবণে দশদিক্ বধির হইয়া গিয়াছিল। ইহাঁর দুইটি দংষ্ট্রা ইন্দ্রধনুর সমান ছিল, ভ্রূযুগল নীলমেঘ বা অংজন পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, এবং শ্মশ্রু ভয়ানক দীর্ঘ ছিল। এইরূপ মহা ভয়ঙ্কর রূপধারী বীরভদ্র, ত্রিশূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন মহারাজ! আমাকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন?

মহাদেব বলিলেন।

হে বীরভদ্র! এ সময় দেবতারা নৃসিংহের ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভয়

পাইয়াছেন; এজন্য তুমি নৃসিংহরূপী অগ্নিকে শীঘ্র গিয়া শান্ত কর। প্রথমে মিষ্টবচনে তাহাকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিবে; তাহাতে যদি সে একান্ত না মানে, তবে নিজ ভৈরব মূর্ত্তি দেখাইও। সূক্ষ্ম দ্বারা সূক্ষ্ম, ও স্থূলকে স্থূলতেজ দ্বারা সংহার করিবে। আমার আদেশানুযায়ী তুমি নৃসিংহদেবের মুণ্ড ও শরীরের চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইয়া আসিবে। এইরূপে মহাদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বীরভদ্র নৃসিংহ সমীপে আগমন করিয়া তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বুঝাইতে লাগিলেন যথা :—

বীরভদ্র বললেন।

হে নৃসিংহদেব! আপনি জগতের সুখের কারণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মহাদেবও, আপনাকে জগত রক্ষার ভার প্রদান করিয়াছেন। দেখুন মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আপনি এই জগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম ও বরাহরূপ ধারণ করিয়া, আপনি জগতকে ধারণ করিয়াছিলেন। এই নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াও, আপনি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন। এখন আপনি আমার অনুরোধে আপনার এই অত্যন্ত প্রচণ্ড মূর্ত্তির উপসংহার করুন, কারণ আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া, জগতের সকলেই অত্যন্ত ত্রাসিত হইয়াছে।

সূত বলিতেছেন।

হে মুনীশ্বরগণ! এইরূপে বীরভদ্র অনেক সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা নৃসিংহদেবকে বুঝাইলেন; পরন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। বরং ক্রোধে অধির হইয়া বীরভদ্রকে বলিতে লাগিলেন।

নৃসিংহ বলিতেছেন।

হে বীরভদ্র! যে স্থান হইতে তুমি আগমন করিয়াছ, তথায় পুনরাবর্ত্তন কর। আমি চরাচর জগত এই মুহূর্ত্তেই সংহার বা ধ্বংস করিব। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আমারই নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং সেই ব্রহ্মার ললাট হইতে শিব উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগতের প্রলয়কারী সাক্ষাৎ কালস্বরূপ আমাকেই জানিবে। আমি মৃত্যুরও মৃত্যু; হে বীরভদ্র! সমগ্র দেবতাগণ আমার কৃপাবলেই জীবিত থাকে।

সূত বলিতেছেন।

হে মুনীশ্বরগণ! এইরূপে নৃসিংহদেবের অভিমানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, বীরভদ্র কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন!

বীরভদ্র বলিতেছেন।

হে নৃসিংহ! জগতের সংহারকর্ত্তারূপ সাক্ষাৎ শিবকে কি তুমি জ্ঞাত নহ?

তোমার এরূপ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করা, কেবল তোমার নিজের নাশের হেতু হইতেছে। তুমি ভাবিয়া দেখ যে, তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের স্বরূপ, এখন কোথায়? অর্থাৎ তাহা এক্ষণে নাই, তদ্রূপ তোমার বর্ত্তমান অবতারের স্বরূপও পরে থাকিবে না। তোমার এই ক্রুর স্বভাবের জন্য, আমি তোমাকে শীঘ্রই সংহার করিব। তুমি কি জাননা যে, তুমি প্রকৃতিস্বরূপা, এবং শিবই সাক্ষাৎ পুরুষ স্বরূপ? শিব তোমাতে বীর্য্যনিষেক করাতেই তোমায় নাভিকমল হইতে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

হে নৃসিংহ! যদি তুমি মহাদেবকে নিজ পৌত্র বলিয়া জ্ঞান কর, ও তজ্জন্য তোমার অভিমান হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, তুমি অজ্ঞান বশতঃ আপনাকে পালন কর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছ। শিবশক্তিবলে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় তুমি ঘুরিতেছ মাত্র জানিও। রে মূঢ়! তোমার কূর্ম্ম অবতারের ললাট দেশ, এখনও শিবের মুণ্ডমালায় সংলগ্ন আছে; এবং তোর বরাহ অবতারের দন্ত, রুদ্র কর্ত্তৃক উৎপাটিত হইয়াছিল, যাহাতে তুই অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলি। তোর বিশ্বকসেন রূপকে মহাদেব নিজ ত্রিশূলাগ্রে দগ্ধ করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞে আমিই তোর যজ্ঞরূপ মস্তক ছেদন করিয়াছিলাম। তোর পুত্র ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ড আজ পর্য্যন্ত কাটা পড়িয়া আছে। শিবভক্ত দধীচি, তোকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিল। এই সমস্ত কথা কি তুই সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিস? আমি দেখিতেছি যে তোর মস্তক শীঘ্রই ছেদিত হইবার জন্য কণ্ডূয়মান হইতেছে। এই যে সুদর্শন চক্র, যাহার বলে তুই এত অভিমান ও আপনাকে মহাপরাক্রমী জ্ঞান করিতেছিস, ইহা তুই কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিস? ও কেই বা ইহার কর্ত্তা? তুই কি সমস্তই ভুলিয়া গেলি? প্রলয়কালে যখন আমি সকলের সংহার করিলাম, তুই যে সে সময় মোহে পতিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া শয়ন করিয়াছিলি। তুই যতদূর সাত্ত্বিক, ও তোর সমস্ত বলাবল ইহাতেই জানা যাইতেছে। তুই শাস্তা অর্থাৎ শাসনকারী নহিস্, অথবা তুই ব্রহ্মাও নহিস্, অর্থাৎ বস্তুতঃ তুই কিছুই নহিস্; এখনও বিচার করিয়া দেখ, ও নিজ মূর্ত্তির উপসংহার কর, নচেৎ মহাভৈরব শিবক্রোধরূপ বজ্র, তোর মস্তকে পতিত হইবে।

সূত বলিতেছেন

হে মুনীশ্বরগণ! এই কথা শুনিয়া নৃসিংহ অত্যন্ত ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া

উঠিলেন; এবং ভয়ানক ঘোর শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক, বীরভদ্রকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই অবসরে বীরভদ্র, মহাঘোর ও শত্রুগণের ভয়কারী শিবতেজোৎপন্ন অতি দুর্দ্ধর্ষ ও আকাশব্যাপ্ত মহা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। তাহার সহস্র ভুজ, মস্তকে চক্র সুশোভিত, সেই ভয়ঙ্কর রূপের অর্দ্ধেক মৃগ ও অর্দ্ধেক পক্ষীর পক্ষ স্বরূপ। দুই দিকে অতি বৃহৎ পক্ষ, চঞ্চু বজ্রতুল্য, কণ্ঠ নীল বর্ণ, চারি পদ, ও প্রলয়াগ্নি সদৃশ দেদ্দীপামান দেহ অত্যন্ত বৃহৎও ত্রিনেত্রযুক্ত ছিল। তিনি এইরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রলয় মেঘের ন্যায়, গম্ভীর শব্দরূপ দারুণ হুঙ্কার করিয়া, নৃসিংহের সম্মুখে মহারুদ্ররূপে, উপস্থিত হইলেন। নৃসিংহ এই রূপ দেখিয়াই, একবারেই ভয়ে হীনতেজ হইয়া পড়িলেন। তাহার সমস্ত পরাক্রম নষ্ট হইয়া গেল। যেরূপ সূর্য্যের সম্মুখে খদ্যোতের জ্যোতি নষ্ট হয়, তদ্রূপ নৃসিংহের অবস্থ ঘটিল। শরভরূপ মহাদেবও, নিজ পুচ্ছ দ্বারা নৃসিংহের পা লটকাইয়া, নিজ হস্তের দ্বারা হস্তকে চাপিয়া, তাহার বক্ষস্থলে বজ্র চঞ্চু প্রহার করিতে লাগিলেন; ও যেরূপ গরুড় সর্পকে লইয়া আকাশে উড্ডীয়মান হয়, তদ্রূপ বীরভদ্র, ভয়ভীত নৃসিংহকে প্রহার করিতে করিতে আকাশে উড্ডীয়মান হইলেন, ও তথা হইতে একবারে ভূমিতলে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন, ও পুনরায় তুলিয়া আবার ফেলিলেন এইরূপে অনেকবার তুলিয়া আছড়াইয়া ফেলিলেন। তৎপরে যখন নৃসিংহ দেব অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাকে লইয়া বীরভদ্র আকাশে উড্ডীয়মান হইলেন। তখন সমস্ত দেবতাগণ স্তুতি করিতে করিতে, বীরভদ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহদেব দীনবেশে পরবশ হইয়া, আকাশেই মহাদেবকে করযোড় পূর্ব্বক স্তুতি করিয়াছিলেন। তৎপরে নৃসিংহ শুদ্ধান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যে হে মহারাজ! যখনই আমি অহংকারে মত্ত হইয়া দর্প করিয়াছি; তখনই আপনি আমাকে শাসন করিয়াছেন। বীরভদ্র তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, হে বিষ্ণু! তুমি এখন অশক্ত হইয়াছ, এবং তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরাজিত হইয়াছে। এই বলিয়া নৃসিংহের চর্ম্ম বীরভদ্র ছাড়াইয়া লইলেন, ও তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন নৃসিংহের শরীরের শুক্লবর্ণ অস্থি সকল দৃষ্ট হইল, এবং নৃসিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এখন আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, শিব ভক্তেরা বিষ্ণুভক্তের নিন্দা করেন, ও তাহাদের ইষ্টদেবকে নিজ ইষ্টদেব দ্বারা হত্যা ইত্যাদি করাইয়া,

বৈরনির্য্যাতন সাধন করিয়া থাকেন। এইরূপে কোন কোন পুরাণে বৈষ্ণবেরা শিব ও অপরাপর দেবতাকে বিষ্ণু কর্ত্তৃক অপমানিত করিয়াছেন। অতএব বিচার করিয়া দেখুন যে, হিন্দুরাই পরস্পর, একে অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়া থাকেন, অথবা আর্য্য-সমাজীরা তাহাদের নিন্দা করিয়া বেড়ান, ইহাই পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। (আর্য্য-সমাজের উদ্দেশ্য, উপধর্ম্ম সকলকে উচ্ছেদ করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপন করা। আর্য্যসমাজের কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিরোধ নাই, তবে সত্য কথা বলিতে গেলেই, লোকে চটিয়া যান, ও তজ্জন্যই লোকে আর্য্য-সমাজীকে নিন্দা করেন ও বলেন, যে আর্য্য-সমাজীরা সকলেরই বিরোধী। হিন্দুমাত্রেই বেদ শাস্ত্রকে সর্ব্বোপরি প্রমাণীয় গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু কাজে তাহারা বেদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ স্বরূপতঃ তাহারা বেদের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা বাস্তবিক বেদকে মানিবেন, তাহারা অবশ্যই বেদানুযায়ী কার্য্য করিবেন। আধুনিক স্বার্থপর পণ্ডিতেরা, নিজ অভিমান রক্ষা করিবার জন্য, কতকগুলি বেদবাহ্য মতকে, বেদের দোহাই দিয়া, বৈদিক মত বলিয়া প্রচার করিয়া, জন সাধারণকে ঠকাইয়া থাকেন। এই সমস্ত ঠগ্ ও বঞ্চকদিগের হস্ত হইতে, যাহাতে লোকে পরিত্রাণ পাইয়া, সনাতন ও সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞান স্বরূপ বেদমার্গ প্রাপ্ত হন, তাহাই আর্য্য-সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য; নচেৎ কাহারও নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে। তবে উপধর্ম্মের অসারতা না দেখাইলে, লোকে কিজন্য সার ধর্ম্ম, অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। আজ কাল লোকে অন্ধবিশ্বাসে পুরাণ ও তন্ত্রাদিকেই নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করেন; ও সেই জ্ঞানে বেদকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে, শূদ্রাদির বেদাধিকার নাই, এই ভ্রম বিশ্বাসে, বেদ কেবল ব্রাহ্মণ জন্য, ও পুরাণাদি জনসাধারণের ধর্ম্মশাস্ত্র, এজন্যই উহা গ্রহণীয় বলিয়া, পুরাণানুযায়ী কর্ম্ম করেন। আর্য্যসমাজ এই সমস্ত কুসংস্কার উঠাইবার জন্যই কৃতসংকল্প হইয়াছে; এবং তজ্জন্যই কলিকাতা আর্য্য-সমাজের আজ্ঞানুসারে আমি যৎকিঞ্চিৎ পুরাণের অসারতা প্রদর্শন করাইলাম। যদি একজনও এই অসারতা বুঝিয়া, সত্য বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে আমি নিজ শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে পুরাণের অসারতা ও পুরাণ সকল ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত নহে, তদ্বিষয় প্রমাণ করিয়াছি। আমরা এই প্রবন্ধেই আরও দেখিয়াছি যে পুরাণ

দ যদিচ, অত্যন্ত পুরাতন, পরন্তু ইহার অর্থ ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি নবীন রাণ বাচক নহে, ইহাও সামান্যতঃ প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকদিগের সন্তোষার্থ নঃ পুরাণ শব্দে যে উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি বুঝায়, অথবা ইতিহাসের র্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার আরও দুই চারিটি প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, থা ঃ—শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে।

অধ্বর্য্যুস্তার্ক্ষ্যো বৈপশ্যতো রাজেত্যাহ * * * *

পুরাণং বেদঃসোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত।

শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৪।৩।১৩

এবং গোপথ ব্রাহ্মণ ১।১০; সংখ্যায়ন সূত্র ১৬।১ ও আশ্বলায়ন সূত্র ১০।৭ স্থানে লিখিত আছে। "পুরাণং বেদ" অর্থাৎ পুরাণ বেদ।

উপর্য্যুক্ত শতপথ ব্রাহ্মণ বাক্যের অর্থ এই যে, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে নবম বা দশম দিবসে যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক, কিঞ্চিৎ পুরাণ পাঠ করিয়া যজমানকে শ্রবণ করাইবেন ইত্যাদি। এইরূপে পুরাণ শব্দ ও পুরাণ ব্যাখ্যা বিষয়, শতপথের অন্যান্য অনেক স্থানে লিখিত আছে, উদাহরণ স্বরূপ আর একটী উদ্ধৃত করিতেছি যথা ঃ—

"ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ।

পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি"

ইত্যাদি। শতপথ ১৪।৬।১০।৬

উপনিষদ্ কর্ত্তারা ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষদ্ রূপ পুরাণ বা বেদ শাস্ত্রকে প্রায় তুল্যমূল্য, অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রের পরই, প্রমাণীয় ও গ্রাহ্য, এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন; এমন কি, অনেকে ইহাকে পঞ্চম বেদ স্বরূপ জানিবে এরূপ ও লিখিয়াছেন; যথা—

"সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং।

সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং॥

ছান্দোগ্য ৭ম প্রপা

ইহার তাৎপর্য্য এই—তিনি বলিলেন হে ভগবন্! আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ব বেদ পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস রূপী পুরাণ জ্ঞাত আছি।

এইরূপে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও মনুসংহিতায় লিখিত আছে যথা—

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি"
ইত্যাদি বৃহদারণ্যক ২।৪।১০

এবং

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণিচৈবহি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণাণি খিলাচি চ

মনু ৩।২৩২ শ্লোক।

উপর্য্যুক্ত প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যজ্ঞে ও পিতৃকার্য্যাদিতে, বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থরূপী বা উপনিষদ্রূপী ইতিহাসযুক্ত পুরাণ কথা যজমানকে শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহা ছাড়া ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিও, যজমান শ্রবণ করিবে। আমরা এই পুরাণ শব্দ, প্রমাণীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থ, মনু এবং উপনিষদাদিরূপ অত্যন্ত প্রাচীন, এমন কি, ইহারা ব্যাসদেব, যাহাকে অন্যায় পূর্ব্বক পুরাণ কর্ত্তা বলা যায়, তাহার জন্মাইবার লক্ষ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে, রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখাইয়াছি, যে সমস্ত মহাভারতে কোন স্থানে নবীন পুরাণের নাম উল্লেখ নাই ; পরন্তু পুরাণ সকলের অনেক স্থানে মহাভারতের নাম উল্লেখ আছে ; ইহাও, একটি বিলক্ষণ প্রমাণ যে, মহাভারত আধুনিক পুরাণ সকল অপেক্ষা পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থ। অবশ্য মহাভারতকে একদিন পুরাণ সংজ্ঞা প্রদান করিলেও করিতে পারা যায়। কারণ ইহাতে পুরাণের যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা আছে। অমরকোষ যাহা অত্যন্ত নবীন গ্রন্থ, অর্থাৎ যাহা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময় অমর সিংহ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, "পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্" অর্থাৎ পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা কোন গ্রন্থ যে পুরাণ, তাহা বুঝা যায়। অমরকোষের টীকাকার এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণংপঞ্চলক্ষম্॥

অর্থাৎ যাহাতে সৃষ্টিক্রম, বংশবিবরণ, মন্বন্তর বর্ণন এবং মহান্ বংশোদ্ভব মহাত্মা দিগের চরিত্র বিষয় লিখিত আছে, এরূপ পঞ্চলক্ষণ যুক্ত পুস্তককে

পুরাণ বলা যায়। আজকাল যে সকল পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহাতে বেদবাহ্য দেব দেবীর মাহাত্ম্য কথন, দেবার্চ্চনা, দেবোৎসব ও ব্রত নিয়মাদি বিবরণেই পরিপূর্ণ। এই সকল গ্রন্থে পুরাণের অন্তর্গত যে, যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কেবল আনুসঙ্গিক মাত্র, এবং ইহাতে যে সকল ইতিহাস বিষয় লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, সে সমস্তগুলি, অথবা তাহার অধিকাংশ ভাগ, মিথ্যা কল্পনা মাত্র ও বিশ্বাস যোগ্য নহে ; এবং সৃষ্টিক্রম বিষয় যাহা এই সকল পুরাণে লিখিত আছে, তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ ও প্রায় সকলগুলিই বৈদিক-সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ, যাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিয়াছি। মহাভারত গ্রন্থে কথঞ্চিৎ পুরাণের পঞ্চলক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে, পরন্তু স্বয়ং ব্যাসদেব মহাভারত প্রণয়ন কালে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, উপনিষদ্, ইতিহাস ও পুরাণাদির অর্থ সমর্থন করিয়া, মহাভারত প্রস্তুত করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে ;—

সাঙ্গোপনিষদাঞ্চৈব বেদানাং বিস্তরক্রিয়াঃ।
ইতিহাস পুরাণানামুন্মেষং নির্ম্মিতঞ্চ যৎ॥ ইত্যাদি

মহাভারত আদি পর্ব্ব ৬২।৬৩ শ্লোক।

উপর্য্যুক্ত প্রমাণ দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের প্রণয়নের পূর্ব্বে পুরাণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থাদি প্রচলিত ছিল। এবং ব্যাসদেব ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ মহাভারতে সমর্থন ও বিস্তার করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ২।৯ স্থানে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণানিতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথ-নারাশংসী ইত্যাদি অর্থাৎ পুরাণের নাম ব্রাহ্মণ ইতিহাস নারাশংসী কল্প ইত্যাদি। বলিতে কি, আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে, সায়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য ইহাঁরাও, ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষদাদিকেই ইতিহাস ও পুরাণ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যথা—দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রেণৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকংজগতঃ প্রাগবস্থামুপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্য জাতং পুরাণং। ইতি সায়নাচার্য্য কৃত ঋগ্বেদোপোদ্ঘাতঃ

এবং

ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশীপুরুরবসোঃ সংবাদাদিরুর্ব্বশীহাপ্সরা ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব

পুরাণমেব পুরাণমসম্বাইদমগ্র আসীদিত্যাদি। শঙ্করাচার্য্য কৃত বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্য।

উপর্য্যুক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, বেদের * অন্তর্গত দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণন প্রভৃতির নাম ইতিহাস, এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়া ঘটিত বৃত্তান্তের নাম পুরাণ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থ তাহাই, যাহাতে দেবাসুর সংগ্রাম বিষয় ও মহাত্মাদিগের ইতিহাস লিখিত আছে; এবং বেদানুকূল সৃষ্টি প্রক্রিয়া যে সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহাকে পুরাণ বলা হয়।

এইরূপে বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের নবম সর্গ হইতে একাদশ সর্গের একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র, লোমপাদ রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি, এবং তাঁহার কন্যা শান্তার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ ইত্যাদি, পুরাতন ইতিহাস, যাহা সূতপুত্র সুমন্ত্র সারথি বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাসকে পুরাণ কথা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছিল, যথা—

এতৎশ্রুত্বারহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ ময়াশ্রুতম্॥
ঋত্বিগ্‌ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়াশ্রুতঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্ব্বং কথিতবান্ কথাম্॥ ইত্যাদি

রামায়ণ বালকাণ্ডম্ ৭ম সর্গঃ।

অর্থাৎ মহারাজ দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিলে, সারথি সুমন্ত্র মহারাজকে বলিলেন মহারাজ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা, ঋত্বিক্‌গণের অভিপ্রেত। আমি এক্ষণে এই বিষয়ে পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সেই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইত্যাদি

তৎপরে রামায়ণে আর একটি বিষয় সপ্রমাণ হয় যে, পুরাকালে সূত

---

* সায়নাচার্য্য আধুনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থকেও বেদ বলিয়া স্বীকার করিতেন। বস্তুতঃ সংহিতা বা মন্ত্রভাগকেই বেদ বলা যায়; এবিষয়ের প্রমাণ মৎকৃত বেদনিত্য ও অপৌরুষেয় নামক প্রবন্ধে অনেক লিখিত আছে, যাহার আবশ্যক হইবে তিনি দেখিয়া লইবেন।

জাতীয়েরা পুরাণজ্ঞ বা পুরাণবেত্তা ছিলেন। অযোধ্যা কাণ্ডের ১৫ সর্গের ১৯ শ্লোকে লিখিত আছে।

ইত্যাক্রান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ।
সদা সক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশহ॥ অর্থাৎ এই কথা বলিয়া পুরাণজ্ঞ সুমন্ত্র, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই সতত অবারিতদ্বার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে ঐ অযোধ্যা কাণ্ডের ৬ সর্গের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকায় লিখিত আছে, "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ" অর্থাৎ সূত জাতীয়েরা পুরাণ ব্যবসায়ী। তৎপরে আরও দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসদেব মহাভারত প্রণয়ন করিয়া, তাহা সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণকে সমর্পন করেন, এবং তজ্জন্যই তিনি পুরাণবক্তা হন। আরও দেখুন, সূতজাতীয় উগ্রশ্রবাও পুরাণবেত্তা ছিলেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বের পঞ্চমাধ্যায়ের ৬।৭ শ্লোকে লিখিত আছে—

ইমং বংশমহং পূর্ব্বং ভার্গবন্তে মহামুনে।
নিগদামি যথাযুক্তং পুরাণাশ্রয় সংযুতম্॥

অর্থাৎ উগ্রশ্রবা বলিতেছেন, হে মহামুনে! পুরাণে এই পুরাতন ভৃগুবংশের যেরূপ বৃত্তান্ত আছে, তাহা আমি যথোপযুক্ত বর্ণন করি। মহর্ষি শৌনিক ও মহাভারতের আদি পর্ব্বে বলিয়াছেন;—

পুরাণেহি কথা দিব্যা আদি বংশাশ্চ ধীমতাম্।
কথ্যন্তে যে পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্বাঃ পিতুস্তবঃ॥

অর্থাৎ পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা, ও বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণের আদি বংশের ইতিহাস লিখিত আছে। পূর্ব্বে তোমার পিতার নিকট আমরা ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছি।

উপর্য্যুক্ত প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পুরাকালে সূতজাতীয়েরা পুরাণ ব্যবসায়ী ছিলেন; অধিক কি লিখিব, নবীন পুরাণেও, সূত জাতি যে পুরাণ ব্যবসায় করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহ্নি পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে।

মধ্যমোহোষ সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবিনঃ।
পুরাণেষ্বধিকারোমে কৃতোব্রাহ্মণৈরিহ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূতজাতির দুই প্রকার বৃত্তি বা জীবিকা নিরূপিত হইয়াছে যথা,—পুরাণ কীর্ত্তন ও ক্ষত্রিয় কর্ম্ম। রামায়ণ ও মহাভারতে সূতজাতির সারথ্য ও রাজ বংশের যশো বর্ণন করার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যেরূপ আধুনিক ভট্ট বংশীয়েরা রাজস্থানের নৃপতিগণের যশো কীর্ত্তির ও বংশাবলী বর্ণন করিয়া থাকেন। এমন কি ইহারাই, রাজাদিগের বংশাবলির ইতিহাস রক্ষা করিয়া থাকেন, ও ছিলেন, তদ্রূপ পুরাকালে সূতজাতি কর্ত্তৃক রাজবংশাবলী বিবরণ, ও তৎসংক্রান্ত পুরাবৃত্ত রক্ষিত হইয়া, তাহাই পুরাণ নামে অনেক স্থলে প্রসিদ্ধ হয়। যাহাহউক উপর্য্যুক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুরাকালে সূতজাতীয়েরা পুরাণ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আরও বলিয়াছি যে, আধুনিক প্রচলিত পুরাণ সকল, পুরাকালের কথা দূরে থাকুক, এমন কি অমর সিংহের সময়ের প্রচলিত পুরাণেরও লক্ষণ যুক্ত নহে। এই সকল নবীন গ্রন্থে অধিকাংশ স্থলে, বেদ বাহ্যব্রত ও নিয়মাদির বিষয়, ও মিথ্যা কল্পিত দেব দেবীর পূজা ও তাহাদের অর্চ্চনার বিধি লিখিত আছে। বলিতে কি, নবীন হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ দেওয়াই আধুনিক পুরাণের উদ্দেশ্য। যদি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করাই বাস্তবিক পুরাণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সূত জাতীয়েরা পুরাণ বক্তা না হইয়া কেবল ব্রাহ্মণগণই পুরাণ বর্ণনের অধিকারী হইতেন; ও তাহা হইলে আধুনিক পুরাণে, সূত জাতীয় বিদ্বানদিগকে পুরাণ বক্তা পদে অভিষেক না করিয়া, বেদবাহ্য ষট্কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণদিগকেই ইহার একমাত্র অধিকারী করিতেন সন্দেহ নাই; এবং তাহা হইলে ব্যাসদেব কখনই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া, কোন উত্তম ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব শিষ্যকে সমর্পণ না করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সূতজাতীয় লোককে সমর্পন করিতেন না। এজন্য বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ অমর সিংহের আধুনিক পুরাণের আকাশ পাতাল প্রভেদ সন্দেহ নাই; অতএব আধুনিক পুরাণ সকল অমর সিংহের পর প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, অন্ততঃ মৎস্য পুরাণের বর্ণিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে পৃথক পুস্তক, কারণ মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নিম্নলিখিত লক্ষণ লিখিত আছে।

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমত্তধকৃতা বৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য সংযুতম্॥

যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশ সহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মুচ্যতে॥

অর্থাৎ যে পুরাণ সাবর্ণি, নারদ সমীপে কীর্ত্তন করেন, এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত ও বারম্বার ব্রহ্ম বরাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলে।

এখন পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন যে বর্ত্তমান কালে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ নামে পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহাতে রথন্তর কল্প বিষয় অথবা ব্রহ্মবরাহ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় না, এবং তাহা সাবর্ণি ঋষি কর্ত্তৃক কথিত হয় নাই। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থটি মৎস্য পুরাণের লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে পৃথক্ পুস্তক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও তদীয় যুগল-রূপের উপাসনা বৃত্তান্তেই পরিপূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মের এই অঙ্গটি অত্যন্ত নবীন, সুতরাং এই পুরাণের বয়ঃক্রম অত্যন্ত অল্প তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। সমগ্র ভাগবত পুরাণে রাধার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, অর্থাৎ যে ভাগবত গ্রন্থ, হেমাদ্রী সচিবের সময় বোপদেব প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা লিখিত নাই, অর্থাৎ যে পুস্তক মোটে ৭।৭ শত বৎসর হইল লিখিত হইয়াছে, তাহা কখনই ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচিত হইতে পারে না। কথিত আছে যে, বোপদেব হেমাদ্রির আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন; এই হেমাদ্রী দেবগিরির (অর্থাৎ দৌলতাবাদের) রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন। এখন পণ্ডিতবর শ্রীযুৎ ওয়াল্টর এলিয়ট সাহেব, যিনি দক্ষিণ দেশের অনেক খোদিত লিপির অর্থ করিয়াছেন, তিনি দেবগিরির যদুবংশীয় নৃপতিগণের দানপত্র বিবরণ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, উল্লিখিত রাজা রামচন্দ্র ১১৯৩ শকে অর্থাৎ ১২৭১ খৃষ্টাব্দে দেবগিরির রাজসিংহাসনে অধিরোহন করেন; এজন্য বেশ বুঝা যাইতেছে যে বোপদেব ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এজন্য তৎকৃত ভাগবতেরও আয়ু ঐরূপ হইবেক। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডে পুরুষোত্তম ও ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরের বিষয় বর্ণন আছে, এই দুই মন্দির খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়। তৎপরে ভবিষ্যৎবাণীর ভাণ করিয়া, এই স্কন্দ পুরাণে অনেক নবীন বিষয় লিখিত আছে, যাহা পাঠ করিলেই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, এই পুরাণ ঐ সকল ঘটনা ঘটিবার অনেক পরে লেখা

হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে দুই একটি বর্ণন করিতেছি যথা :—

ত্রিষুবর্ষসহস্রেষু কালযাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনেহস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যাতে ভূভরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিক শতত্রয়ে॥
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপ নির্ম্মুক্তিং যোহভিলপ্স্যাতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যাদিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোহত্র প্রলপ্স্যাতে॥

অর্থাৎ কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে, এই পৃথিবীতে শূদ্রক নামে এক রাজা হইবেন, তিনি মহাবীর ও অতি সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। তিনি পাপিষ্ঠ প্রবল প্রতাপ সমস্ত রাজাদিগকে বধ করিবেন। এবং চর্বিতাতে আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর পরে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য এই নন্দ বংশের নিপাত করিবেন। তৎপরে ৬১০ শকে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন। এক্ষণে উপর্য্যুক্ত ভবিষ্যৎবাণী পাঠ করিলেই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্কন্দ পুরাণ রাজা বিক্রমাদিত্যের পরে লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এরূপ ভবিষ্যৎবাণী হইতে পারে না, কারণ জীব বা মনুষ্য, কর্ম্ম করিতে স্বতন্ত্র, এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিতে পরতন্ত্র, বা ঈশ্বরের অধীন। আমরা যেরূপ কর্ম্ম করিব, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে তদনুযায়ী আমরা ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকি। যাহা ঘটিবে, তাহা যদি আপনা আপনি ঘটিবে, এরূপ হইত, বা এরূপ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য থাকিত, তবে মনুষ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী সম্ভব হইতে পারে; পরন্তু তাহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে; বিশেষতঃ, "গহণা কর্ম্মণোগতিঃ" বলিয়া ব্যাসদেব নির্ণয় করিয়াছেন। যদি অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহাই হইবে, এইরূপ হইত, তবে সংসারে, পাপ পুণ্য, সুকৃতি দুষ্কৃতি, ইত্যাদি কিছুই থাকিত না; ও বেদাদি সত্য শাস্ত্রের প্রচারেরও আবশ্যক ছিল না। বলিতে কি, এরূপ বিশ্বাস করা, নাস্তিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ বিষয়ের বিশেষ বিচার, আমরা দৈব ও পুরুষকার নামক প্রবন্ধে পাঠ করিলেই ভ্রম নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

যাহা হউক, এইরূপে পদ্মপুরাণে শিব পার্ব্বতী সংবাদে, শঙ্কর স্বামীর বিষয় উল্লেখ আছে যে, তিনি প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ ছিলেন। এই পদ্মপুরাণে, বিষ্ণু ভিন্ন সকল দেবতারই নিন্দা লিখিত আছে। আমরা যদিচ ইতঃপূর্ব্বে এক পুরাণে অপর পুরাণের নিন্দার বিষয় লিখিয়াছি, তথাপি এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ ২।১টী উদ্ধৃত করিতেছি।

মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যাং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
ইতরেষান্তু দেবানাং নির্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ॥
সকৃদেবো হি যো হশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালো ভবেৎ ধ্রুবম্॥
কল্পকটী সহস্রাণি পচ্যতি নরকাগ্নিনা।

পদ্ম পুরাণ

পদ্ম পুরাণ খণ্ড ৭৮ অধ্যায়।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদের্ভূরি মানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারিহস্তেষাং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গংবিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনাস্তু বৈষ্ণবঃ।
ন কার্য্যাপ্রার্থনাতেভ্য স্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ॥

পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড ১০০ অধ্যায়

তথান্য দেবতা ভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদুষমতিমিপ্রাণা চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পিতরং নরকং নয়েৎ।

ইত্যাদি ঐ ঐ ১০৩ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ, বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হইবে। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য গর্হিত। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, একবার মাত্রও, শিবাদি প্রসাদ ভোজন করে, তাহাকে নিশ্চয় চাণ্ডাল বলিয়া জানিবে। সে কোটী সহস্র কল্প পর্য্যন্ত নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈবাদির সংসর্গ ত্যাগ করিবে, ও তাহাদের নিকট কোন প্রার্থনা পর্য্যন্ত করিবে না; তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য পুরীষ তুল্য। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার ভক্তি করা, ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম; যে ব্রাহ্মণ এরূপ করে, সে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়; ও তাহার সমুদায় সুকৃতি নষ্ট হইয়া যায়, ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

এরূপ শ্লোক নবীন পুরাণে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, পরন্তু অনর্থক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নহে, এজন্য ক্ষান্ত হইলাম। এইরূপে বিষ্ণুর নিন্দা, তন্ত্রে ও অপরাপর পুরাণে অনেক স্থানে লিখিত আছে, যাহার উদাহরণ ইতঃপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি; এজন্য এখানে আর বর্ণন করিলাম না। ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের পুরাণ, কদাপি ব্যাসদেব বা কোন এক জনের লেখা হইতে পারে না। তৎপরে অনেক আধুনিক হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে, সাম্প্রদায়িক ভেদে তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ নাই; ইহা যে সত্য নহে, তদ্বিষয়ও আমরা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি বিষ্ণু পুরাণ, যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুরাতন পুরাণ বলিয়া অনেকের ধারণা, তাহাই যে পুরাতন নহে, তাহাই প্রমাণ করিতেছি—

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে, বৌদ্ধ, আর্হত অর্থাৎ জৈনদিগের উপাখ্যান লিখিত আছে এবং ইহাতে উহাদিগের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্ধদিগের সঙ্গে, এতদ্দেশীয়দিগের যখন বিরোধ হইয়াছিল, তাহার পরে অবশ্যই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তৎপরে স্কন্দ পুরাণের ন্যায়, ইহাতেও ভবিষ্যৎ বাণীর ছলে, অনেক নবীন অর্থাৎ আধুনিক বিষয় লিখিত আছে। যথা মৌর্য, সুঙ্গ, কণ্ব ও অন্ধ্রাদি রাজবংশের কথা লেখা আছে, যাহা মনঃকল্পিত নহে, পরন্তু ইতিহাসেও লব্ধ মুদ্রাদিতে ও খোদিত লিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি মৌর্য রাজ্য প্রবর্ত্তক চন্দ্রগুপ্ত, খৃষ্টাব্দের ৩১২ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, যাহা গ্রীক্ গ্রন্থাকারদিগের প্রমাণেও পাওয়া যায়। ইতিহাসে সুঙ্গাদি বংশীয়দিগেরও বর্ণন পাওয়া যায়। তৎপরে বিষ্ণু পুরাণে, শিব ব্রহ্মার ললাট হইতে উৎপন্ন নিকৃষ্টত্বে বিষয়ও বর্ণিত আছে, যাহার দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ইহা শৈবগ্রন্থ অর্থাৎ তন্ত্রাদির পর লিখিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ পুরাণ লিখিতে গেলে, এত অধিক লিখিতে হয় যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা স্থান পাওয়া অসম্ভব, এজন্য আমি তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। ফল কথা, যাহা লেখা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই সম্পূর্ণ প্রমাণীত হইতেছে যে, পুরাণ সকল বাস্তবিক নবীন গ্রন্থ, এবং ইহারা আমাদের মানিবার উপযুক্ত গ্রন্থ নহে; ইহারা বেদ প্রতিকূল এবং ইহাদিগের প্রণেতা ব্যাসদেব নহেন। ইতি

ওম্ শিবম্।